অপরাধী সম্রাট

শ্রীস্বপনকুমার

সি.আ.ই ডি. সিরিজ—২নং

অপরাধী সম্রাট

শ্রীস্বপনকুমার

রাজেন্দ্র লাইব্রেরী
১৩২, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড
[ক্যানিং স্ট্রীট (দ্বিতল)]
কলিকাতা-৭০০ ০০১

মূল্য—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা

চিকেন দোপেঁয়াজী, কড়াইশুঁটির কচুরি, ডিমের চপ, গজা আর সন্দেশ।

—বাঃ, সুন্দর। শুনেই যে জিভ সরস হয়ে আসছে।

—তা ত আসবেই। দীপক বললে—বিশেষ করে ভজার রান্না—

—তা বটে, ভেরী নাইস।

ভজা চলে গেল খাবার আনতে। দীপক বললে—এবারে তাহলে আপনার আগমনের উদ্দেশ্যটা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করুন।

—নিশ্চয়ই। এবার তাহলে যে উদ্দেশ্যে আমার আসা, তা বলছি। আচ্ছা, আপনি ত শুনলাম বহুদিন ডিটেকশনে নিযুক্ত আছেন দীপকবাবু, কিন্তু 'অপরাধী সংঘ' বলে কোনও দলের নাম শুনেছেন কি? তাদের প্রধান দলপতি নিজেকে অপরাধী জগতের সম্রাট বা 'অপরাধী সম্রাট' বলে পরিচয় দেয়।

দীপক চিন্তা করে। বলে—আমাকে তাহলে অপরাধীদের রেফারেন্স বইটা দেখতে হবে। দীপক একটা বিরাট বাঁধান খাতা বের করল। তাতে অজস্র অপরাধীর ছবি ও রেফারেন্স লেখা আছে।

দীপক দেখতে পেল একটা পাতায় লেখা আছে 'অপরাধী সম্রাট'। কুখ্যাত অ্যাংলো চাইনিজ দস্যু—পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কাজ করে। নিজের একটা বিরাট দল আছে। নানা দেশে কাজ করে। তার দল অপরাধী সংঘ নামে পরিচিত। তারা নানা ধরনের অপরাধ করে এবং মানুষের প্রাণকে একেবারে তুচ্ছজ্ঞান করে।

এইটুকুই মাত্র লেখা ছিল।

দীপক বললে—এর বেশি ত লেখা নেই, কিন্তু হঠাৎ একথা কেন মিঃ সেন?

—কারণ আছে। শুনেছি এই দল বর্তমানে ভারতে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং বিভিন্ন অংশে কাজ করে বেড়াচ্ছে তারা। এমন কি,

কয়েকদিন আগে কি একটা কাজের ছুতো ধরে তাদের দলপতি কোলকাতাতে এসে নাকি উপস্থিত। তবে দক্ষিণ ভারতেই তারা কাজ করেছে বেশি।

—যা হোক্, এখন পর্যন্ত তারা কি ভারতে কিছু কাজকর্ম করেছে?

—হ্যাঁ, দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে তাদের প্রধান কর্মস্থল। সেখানে ইতিমধ্যেই যেমন পুলিশ দল তাদের পেছনে সক্রিয় হয়েছে, তেমনি তারাও সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। তবে একজন ধনী শেঠজী মোটা টাকা তাদের দিতে প্রতিশ্রুত হয়েও তা দেননি। তিনি গোপনে পালিয়ে এসেছেন এই কোলকাতায়।

—তারপর?

—তাঁর নাম শেঠ ভকতরাম। তাঁর কাছে এই দল এক লক্ষ টাকা দাবী করে। কিন্তু তিনি তা না দিয়ে গোপনে পালিয়ে আসেন। ভকত-রামের কাছে অপরাধী সংঘ জানিয়েছিল যে তিনি ঐ টাকা না দিলে তারা তাঁকে হত্যা করবে।

আর সত্যিই ঘটেছে ঠিক তাই—এখন নাকি তারা তাঁকে ফলো করে কোলকাতা পর্যন্ত ধাওয়া করেছে।

—এত বড় বিশ্রী ব্যাপার মিঃ সেন।

—সত্যিই তাই। আজই ভকতরাম এসেছিলেন পুলিশ হেডকোয়া-র্টারে সাহায্যের আশায়। তিনি বলেছেন, যত টাকাই লাগুক তিনি ব্যয় করবেন—তবে তাঁর প্রাণরক্ষা করতে হবে। তাই ত একাজে তিনি আপনাকে নিযুক্ত করতে চান দীপকবাবু।

—বুঝেছি।

—তিনি উঠেছেন তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। সে বাড়িটা খালি পড়ে ছিল দারোয়ানের জিম্মায়। বর্তমানে ভকতরাম ঐ বাড়িটা ভাড়া নিয়ে সেখানেই উঠেছেন।

—ভাল কথা। তা ঐ বাড়িটা পাহারা দেবার ব্যবস্থা কিছু করেছেন কি?

—হ্যাঁ। আমি চারজন আর্মড্ পুলিশকে আজ থেকেই ডিউটিতে বসিয়ে দিয়েছি।

—তা ভাল। কিন্তু একটা কথা—

—বলুন।

—ভকতরাম কি নিশ্চিত জানেন যে অপরাধী সংঘ তাঁকে অনুসরণ করে বাংলা পর্যন্ত এসেছে?

—হ্যাঁ।

—কি করে তিনি নিশ্চিত হলেন?

অপরাধী সংঘের একটা নিয়ম আছে। তা হলো তারা যখন কাউকে অনুসরণ করে তাদের লক্ষ্যে উপস্থিত হয়, তখন গভীর রাতে সে-বাড়ির কাছে কোথাও তারা একটা বিচিত্র শব্দ করে।

—কি রকম শব্দ?

—অনেকটা যেন বিদেশী ভাষায় ছড়া বললে যেমন হয় তেমনি করে তারা একটানা সুরে যেন বলে।

—তার অর্থ?

—তা ঠিক জানিনা। তবে তা হলো অনেকটা এই রকম যে—আমরা এসেছি। তোমার সাধ্য থাকে আমাদের কাজে বাধা দাও।

—আশ্চর্য ত!

—সত্যিই তাই, অনেকটা আমাদের দেশের প্রাচীন ডাকাতরা যেমন চিঠি দিয়ে ডাকাতি করত, ওরাও তেমনি চ্যালেঞ্জ করে নরহত্যা করে। নরহত্যা করাটা ওদের কাছে অতি সাধারণ একটা ব্যাপার মাত্র। মানুষের প্রাণকে ওরা একটা সাধারণ কুকুর-বেড়ালের প্রাণের চেয়েও তুচ্ছজ্ঞান করে।

—বুঝেছি।

—এখন তাহলে আপনি কি এ কেসে আমাকে সাহায্য করতে রাজী আছেন ?

—বেশ ত, বলুন কি করতে হবে আমাকে ?

—চলুন তাহলে, প্রথমে ভকতরামের সঙ্গে দেখা করি।

—তিনি থাকেন কোথায় ?

—এলগিন রোডের একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে তিনি বাসা করেছেন। ঠিকানা দিয়ে গেছেন।

—বেশ, তবে চলুন যাওয়া যাক সেখানে।

—হ্যাঁ। খাওয়া শেষ হয়ে গেল, এবারে চলুন আমরা কর্মের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি।

—ঠিক আছে চলুন।

দীপক উঠে দাঁড়াল।

। দুই ।

—ঘনীভূত রহস্য—

শেঠ ভকতরাম যে বাড়িটাতে বাস করছিলেন সেটা একটা দোতলা ছোট বাড়ি।

বাড়ির সামনে চারজন আর্মড পুলিশ বসেছিল—তারা উঠে দাঁড়াল ওঁদের দেখে! স্যালুট করল।

মিঃ সেন তাদের বসতে বলে দীপককে নিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেন।

দীপক মিঃ সেনকে বললেন—ভকতরাম কি এই বাড়িতে দীর্ঘদিন থাকবেন নাকি?

—হ্যাঁ যদি এখানে নিজেকে বিপন্ন মনে করেন, তবে গোপনে কোলকাতা শহর ছেড়ে আবার অন্যত্র যাবেন।

—বুঝেছি।

মিঃ সেন শেঠ ভকতরামের সঙ্গে দীপকের পরিচয় করিয়ে দেন।

দীপক বলে—কয়েকটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করার ছিল, শেঠজী।

—বলুন।

—এই অপরাধী সংঘের নজর হঠাৎ আপনার উপরে পড়ল কি করে?

—তা জানি না। তবে ওদের নজর যে কখন কার উপর পড়বে তা কেউ বলতে পারে না।

—বুঝেছি। তা আপনি যে এক লক্ষ টাকা দিতে সক্ষম, এ ধারণা ওরা করল কি করে?

—যার পেছনে ওরা লাগে, তার বিষয়ে সব খবর সংগ্রহ করে তারা।

—বুঝেছি। আচ্ছা, ওরা যে এখানেও আপনাকে অনুসরণ করেছে তা জানলেন কি করে?

—প্রথমে ওরা টাকা দাবী করেছিল চিঠির মাধ্যমে। তারপর ফোন করেছিল। আমি ফোনে জানাই যে টাকা দেবার জন্যে চেষ্টা করছি—তবে টাকা জোগাড় করতে সময় লাগবে।

—তারপর?

—তার পরের দিনই আমি মাদ্রাজ থেকে চলে আসি পালিয়ে।

—আপনাকে কি ওরা অনুসরণ করতে পেরেছিল বলে মনে করেন?

—না। ট্রেনে কেউ আমাকে অনুসরণ করেছে বলে বুঝতে পারিনি। এখানে এসেছি চারদিন। এখানেও প্রথম দু'দিন কিছু বুঝতে পারিনি। হঠাৎ পরশু দিন রাতে প্রথম জানতে পারলাম ব্যাপারটা।

—কি ভাবে?

—রাত তখন বোধহয় বারোটা কি একটা হবে। হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো, বাড়ির সামনে দিয়ে পর পর দু'জন লোক যেন চলে গেল। তাদের পরনে কালো রঙের আলখাল্লা। মুখটাও আবৃত ছিল—তাদের চিনতে পারিনি। তারা একে একে চলে যাবার পর, হঠাৎ দূর থেকে একটা শব্দ ভেসে এলো। ঠিক বেদেরা যেমন সাপের মন্ত্র পড়ে, তেমনি সুরে কে যেন চীৎকার করছিল দূর থেকে। যেন কি একটা ছড়া আবৃত্তি করছিল বলে মনে হলো।

—এটা যে ওরাই করেছে তা জানলেন কি করে?

—কারণ আছে। এই ধরনের ছড়া যে যে লোক শুনতে পেয়েছে—তাদের সবাইকে জীবন দিতে হয়েছে। তাই এটা যে কত বড় বিপজ্জনক ব্যাপার তা বুঝতেই পারছেন।

—তা বটে। যা হোক, আপনি ভয় পাবেন না। মিঃ সেন আপনার বাড়ি পাহারা দেবেন। আমিও পাহারা দেবো। আশা করি, আপনি বিপদে পড়বেন না শেঠজী।

—একটা কথা ভাবছি বাবুজী—

—বলুন।

—আমি যদি প্লেনে চেপে কাল রাতেই দিল্লী চলে যাই ?

—তা যেতে পারেন। আমরা তাহলে পুলিশ পাহারা দিয়ে আপনাকে দমদমে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দেবো। কিন্তু আপনাকে যে ওরা কেউ ফলো করবে না, তা কি করে বুঝতে পারবেন ?

—তা ঠিক কথা।

—আর যদি দিল্লীতে আপনি বিপন্ন হন, তাহলে আপনার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠবে।

—তা বটে। আচ্ছা, আমি যা হোক্ ভেবে ঠিক করি। আপনি আজ থেকেই ত পাহারা দেবেন মিঃ সেন ?

—হ্যাঁ।

দীপক কথা বলছিল ঘরে বসে—তবে তার চোখ সর্বদাই বাড়ির সামনের পথে ঘোরা-ফেরা করছিল।

হঠাৎ কি একটা জিনিস দেখে দীপক ঠিক শিকারী কুকুরের মতই লাফিয়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে একটা ছোরা ছুটে এসে দরজায় বিদ্ধ হলো।

দীপক দৌড়ে নিচে নেমে গেল। মিঃ সেন জানালা দিয়ে দেখলেন একজন লোক উল্টো ফুটপাত ধরে ছুটে গেল সামনের দিকে।

দীপক নিচে নামার আগেই লোকটা একটা গাড়িতে চেপে বসল। গাড়িটা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। সেটা প্রচণ্ড গতিতে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপক নিচে এসে দেখল, ওরা পালিয়ে গেছে।

সে হতাশভাবে আবার ফিরে এলো বাড়ির মধ্যে।

তার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মিঃ সেন বললেন—পালিয়ে গেল দেখছি।

—হ্যাঁ।

এবারে দীপক জানালার কাছে গেল, দেখে ছোরাটা বিঁধে আছে, তার সঙ্গে ভাঁজ-করা একটা কাগজ আটকানো।

দীপক ছোরাটা টেনে নিয়ে কাগজটা বের করে নিল। দেখে সেটা একটা চিঠি। তাতে লেখা ছিল :

প্রিয় মিঃ সেন ও দীপকবাবু,

আপনারা বড় কঠিন কাজে হাত দিতে চলেছেন। জেনে রাখুন, আমাদের হাত থেকে কখনো শিকার ফস্‌কে যায় না। আমাদের শিকারকে সাহায্য করছেন করুন, কিন্তু এর ফলে আপনারা বিপন্ন হবেন।

তবে যখন সাহস করে বাধা দিতে এগিয়ে আসছেন, তখন আপনাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম। আপনাদের ওপরে প্রতিশোধ নিতে চাই না—তবে নির্দিষ্ট দিনে আমি যথানিয়মে আমার কথা ঠিক রাখব।

আগামী কাল রাতের মধ্যে কাজ সমাধা করব। শেঠজীকে তার অর্বাচীনতার জন্যে কঠোর শাস্তি দেবো। ইতি—

দলপতি, অপরাধী সংঘ।

চিঠিটা পড়ে দীপক ও মিঃ সেন দুজনে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ কাটল।

একটু পরে ক্ষণিক আকস্মিকতা সামলে নিয়ে দীপক বললে—ওদের সাহস দেখে আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে যাচ্ছি!

—শুধু তাই নয়। ওরা পুলিশকে কিছুমাত্র ভয় করে বলে মনেই হয় না।

—তা বটে। কিন্তু আমরা যদি এতে ঘাবড়ে যাই তাহলে ত চলবে না। আমাদের কাজ ঠিকমত করে যেতে হবে।

—তা ত ঠিক কথাই।

—দূর থেকে চিঠি ছুঁড়ে-মারা এক কথা, আর এখানে প্রবেশ করে নরহত্যা করা অন্য কথা।

—তা বটে।

—দেখা যাক্, ওদের কত ক্ষমতা। যেমন করেই হোক, ওদের কাজে বাধা দিতেই হবে।

—তা ত নিশ্চয়ই।

একটু পরে দীপক বললে—তাহলে আজ বিকেল থেকেই আপনি দুজন অফিসারকে পাহারা দিতে বলুন এই ঘরে। আর আগামীকাল আপনি নিজে থাকবেন। আমিও থাকব।

—ঠিক আছে।

* * *

দীপক সেখান থেকে রওনা হলো বাড়ির দিকে। বাড়ি ফিরে দেখে তার সহকর্মী রতনলাল তারই প্রতিক্ষায় বসে আছে। দীপক বললে—নতুন একটা কঠিন কাজে হাত দিতে হলো রতন।

রতন দীপকের মুখের দিকে তাকাল।

অপরাধী সংঘের বিষয়ে সব কথা দীপক বললে রতনকে। তারপর বললে—তোকেও একটা কাজের ভার নিতে হবে।

—কি কাজ?

—আজ বিকেল থেকে তুই একটা ভিখারীর ছদ্মবেশে শেঠজীর বাড়ির সামনে প্রতীক্ষা করে থাকবি। ওদের কর্মপদ্ধতির উপর নজর রাখতে হবে।

—আচ্ছা।

—যদি সন্দেহজনক কাউকে দেখিস, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফলো করতে হবে।

রতন রাজী হলো।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। দীপক রিসিভার তুলে বলল—হ্যালো—কে?

—আমি অপরাধী সংঘের একজন সদস্য কথা বলছি। আমি দীপকবাবুকে চাই।

—আমিই দীপক চাটার্জী। কি চাই বলুন?

—আমরা ভারতের বুকে আপনার মত প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে কাজ করতে যাচ্ছি বলে গর্বিত। তবে একটা কথা—আমাদের দলপতি চাননা যে আপনার মত একজন বিখ্যাত লোক অকালে প্রাণ হারান। তাই আপনাকে একাজ থেকে বিরত হতে তিনি অনুরোধ করেছেন।

—কিন্তু তিনি একটা ভুল করেছেন।

—কি ভুল?

—তিনি জানেন না যে দীপক চ্যাটার্জীকে কখনো তার মতের বিরুদ্ধে কিছু করানো যায় না।

—তা জানি। তবুও যদি আপনি তাঁর কথা শোনেন তিনি খুশী হবেন।

—কোনও ক্রিমিন্যালকে খুশী করা আমার অভ্যাস নেই, তা মনে রাখবেন।

আর কোন কথা না বলে দীপক টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

॥ তিন ॥

— দস্যু-কবলে ভকতরাম —

পরদিন সকাল থেকেই পুলিশ বাহিনী যেন একটা জালের মতই ব্যূহ রচনা করে শেঠ ভকতরামের বাড়িটা ঘিরে বসে রইল।

শেঠজী সকালে ঘুম থেকে উঠে যখন চা খাচ্ছিলেন, তখনই দীপক ও মিঃ সেন সেখানে উপস্থিত হলেন।

শেঠজী একটু বেলাতে ঘুম থেকে উঠতেন।

দীপক বললে—বাড়ি থেকে কিন্তু আজ আপনার বেরুনো চলবে না।

—কেন বলুন ত?

—কারণ আজকেই ওরা চ্যালেঞ্জ করেছে, তাই আজ দিনরাত আপনাকে চোখে চোখে রাখা হবে এখানেই।

—ঠিক আছে, তবে আজ আমি বাড়িতেই থাকব।

একতলায় ঘর চারটি—দোতলায় তিনখানা মাত্র ঘর।

একটা ঘর শেঠজীর শয়ন-ঘর, একটি তিনি বাইরের দিকে রেখেছেন, আর একটা ঘরে তিনি কিছু বই ও পত্র-পত্রিকা রেখেছেন—অবসর সময়ে তিনি সেখানে পড়াশুনা করেন।

দীপকরা বাইরের ঘরে বসে রইল।

বেলা বারোটা পর্যন্ত দীপক শেঠজীর বাড়িতে কাটাল—তবে কানও গোলমাল হলো না।

মিঃ সেন বললেন—ওদের এমন সাহস হবে না যে এই ঘরে ঢুকে কিছু করবে।

দীপক বললে—না হলে ত ভালই। তবে ওই সব দুর্ধর্ষ ক্রিমিন্যালকে বিশ্বাস নেই।

—তা বটে।

এমনি নানা কথার পর শেঠজী ভেতরে চলে গেলেন।

দীপকরাও সামান্য চা ও খাবার খেয়ে আবার বসে রইলো চুপচাপ।

এর পরে পুলিশ অফিসাররা খেতে বসলেন।

দীপক বললে—একবার আমাকে বাড়ি যেতে হবে।

মিঃ সেন বললেন—আবার কখন আসবেন?

—বিকেল চারটায়।

—ঠিক আছে।

দীপক বেরিয়ে গেল বাড়ির উদ্দেশ্যে। দেখল, একটা ভিখারী মোড়ের কাছে বসে ভিক্ষে করছে। দীপক বুঝতে পারলো, রতন তার কাজে অবহেলা করেনি।

* * *

ঠিক বিকেল চারটায় দীপক আর মিঃ সেন আবার এসে উপস্থিত হলেন।

কড়া পাহারা চলছিল। বিনা অনুমতিতে কোনও লোকের ভেতরে প্রবেশের উপায় ছিল না।

দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে সময়।

ঢং ঢং—

রাত আটটা বাজল।

ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ ঘটল এক অঘটন।

যে-ঘরে শেঠ ভকতরাম শুয়েছিলেন হঠাৎ একটা প্রচণ্ড শব্দ হলো তার এক দেয়ালে।

শেঠ ভকতরাম চমকে উঠে তাকান সেদিকে, দেখতে পেলেন হঠাৎ যেন দেয়াল আর মেঝের সংযোগস্থলে একটা জায়গা ফাঁক হয়ে গেল।

সেখানে দেখা গেল দুটি মূর্তি। তাদের হাতে উদ্যত পিস্তল। এখানে যে একটা গোপন সুড়ঙ্গ-পথ ছিল তা শেঠজী জানতেন না।

একজন বললে শয়তান! তুমি আমাদের হাত থেকে পালাতে চাও? তোমার এত সাহস!

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অপরজন একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ল শেঠজীকে লক্ষ্য করে।

—আঃ—

অস্পষ্ট শব্দ!

শেঠজী সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লেন।

আর্তনাদ শুনে দীপক পাশের ঘর থেকে ছুটে এল এই ঘরে। অন্যান্য অফিসাররাও ছুটে এলেন।

সকলে অবাক!

এঘরে তখন দুটি নবাগত আগন্তুক তাদের চোখের সামনে দিয়ে আবার সুড়ঙ্গ-পথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপক গুলি ছুঁড়ল।

গুড়ুম! গুড়ুম!

নৈশ প্রহর যেন কেঁপে কেঁপে উঠল সেই প্রচণ্ড শব্দে।

দুটি মূর্তি কোন্ অজানা পথে যে অদৃশ্য হলো তা বুঝতে পারলেন না কেউ।

দীপক বললে—আশ্চর্য! অভাবনীয়! এ বাড়ীতে যে এমন সুড়ঙ্গ-পথ ছিল তা ওরা কি করে জানতে পারল?

মিঃ সেন সে কথার উত্তর দিতে পারলেন না।

দীপক বললে—আসুন, দেখি এ পথের শেষ কোথায় ?

মূর্তি দুটি অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গ পথটি বন্ধ হয়ে গেছিল।

দীপক অনেক চেষ্টা করেও সে-পথের মুখটি খুলতে পারলে না।

সে হতাশ হলো।

তখন সে নানাস্থানে সন্ধান করতে লাগল। অবশেষে মেঝের একটা জায়গায় একটা ছোট্ট স্থান দেখল, সেটা চৌকো—চারদিকে ফাটল। সেই জায়গাতে চাপ দিতেই আবার মেঝের সুড়ঙ্গ-পথটি খুলে গেল।

দীপক মিঃ সেনকে বললে—আসুন।···

তাঁরা ধীরে ধীরে নামেতে লাগলেন সেই পথটা ধরে।

শেষে এলেন তাঁরা সোজা পথে। কিন্তু সেখানে কাউকে দেখা গেল না।

* * *

কিন্তু অপরাধী সংঘের লোকেরা সবার চোখকে ফাঁকি দিলেও একটি লোককে ফাঁকি দিতে পারেনি। সে হলো রতনলাল।

রতনলাল পিস্তল হাতে লোক দুটিকে পথে নামতে দেখে তাদের অনুসরণ করল।

এই ভিখারীটিই যে রতনলাল তা লোক দুটি কিন্তু কল্পনাও করতে পারল না।

লোক দুটি পথে নেমেই একটা মোটর গাড়িতে চেপে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

তখনো তাদের হাতে ছিল পিস্তল। পিস্তল খাপে ভরে ওরা গাড়িতে উঠে বসল।

রতন তাদের অনুসরণ করে চলল দূর থেকে। মোড়ের মাথায় এসে রতনও একটা ট্যাক্সি নিল।

দুটি গাড়ি ছুটে চলল বেশ একটু দূরত্ব রেখে।

রতন জানত যে তাকে অনুসরণ করতে হবে। সে তাই ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে তার কার্ড দেখাল।

তারপর তার হাতে দশ টাকার একটা নোট গুঁজে দিল।

ড্রাইভার সেলাম করে চলতে সুরু করল।

দুটি গাড়িই বেশ একটু দূরত্ব রেখে ছুটে চলল। কিন্তু আগের গাড়ির ড্রাইভার কল্পনাও করতে পারল না যে পিছনে একটা গাড়ি তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

এস্‌প্ল্যানেড···শ্যামবাজার···

গাড়ী এবার উত্তরে ছুটে চলল।

অবশেষে বরাহনগর।

একটা গলিতে ঢুকল তাদের গাড়িটা। রতন সঙ্গে সঙ্গে অনুসরণ করল। ঢুকল গলির ভেতরে।

একটু এগিয়ে গাড়ি রাখল রতন। ভাবল, আর ভেতরে যাওয়া উচিত নয় গাড়ি নিয়ে।

সে ড্রাইভারকে ভাড়া দিয়ে হেঁটে চলল ওদের অনুসরণ করে।

একটা বিরাট বাড়ি। ভাঙা পড়ো বাড়ি। গাড়িটা তার ভেতরে প্রবেশ করল।

রতন দূর থেকে দেখল সব।

গাড়ি থেকে লোক দুটি নেমে পড়ল। তারপর তারা বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করল।

রতন খুশী হলো। ভাবল, এক্ষুণি দীপককে সব জানাতে হবে। তা হলে বিরাট একটা দল ধরা পড়বে।

রতন তক্ষুণি চলে এলো একটা রিক্সায় চেপে বরাহনগর বাজারের সামনে।

একটা ডাক্তারখানা খোলা ছিল। সে বললে—আমি একটা ফোন করব।

—বেশ ত, করুন।

রতন তক্ষুনি পয়সা দিয়ে ফোন করল দীপককে।

—হ্যালো ··কে ?

—আমি রতন।

—কি খবর ?

—শীগগির পুলিশ বাহিনী নিয়ে চলে এস বরাহনগরের মোড়ে।

—কেন বল তো ?

—অপরাধী সংঘের একটা বাড়ি খুঁজে পেলাম তাদের ফলো করে।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছ আমি আসছি।

রতন ফোন নামিয়ে রাখল।

* * *

আধঘণ্টা পরে।

পুলিশ বাহিনী লরী বোঝাই হয়ে এসে বরাহনগরে যখন পৌছল তখন রাত নটা।

মিঃ সেন এলেন। দীপকও ছিল তাঁর সঙ্গে।

মিঃ সেন বললেন —কি খবর রতনবাবু ?

—আমি ওদের অনুসরণ করেছিলাম। অনুসরণ করে ওদের গোপন আড্ডা খুঁজে পেলাম।

—কোথায় ?

—একটু আগে।

—চলুন তবে।

রতনলাল পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল।

* * *

কিছুটা এগিয়ে চলল তারা।

একটা সরু গলি। তার মধ্যে একটা বাড়ির সামনে এসে রতন বললে—ঐ বাড়িটা।

—ওটা ত পোড়ো বাড়ি!

—হ্যাঁ ওখানেই আছে ওরা। ওই তো, গাড়িটা এখনো আছে। ঐ গাড়িতে করেই এসেছে ওরা দুজনে।

—চলুন ভেতরে।

ভেতরে প্রবেশ করল ওরা।

ভেতরে ঢুকে ওরা দেখতে পেল, প্রতিটি ঘরই ঠিক খোলা আছে!

কি ব্যাপার বুঝতে পারল না কেউ। রতন বিস্মিত হল।

দেখল, সারা বাড়ি খালি পড়ে আছে। শুধু একটা ঘরে তারা পেল একটা চিঠি। দীপক পড়ল চিঠিখানা। তাতে লেখা:

প্রিয় দীপকবাবু ও মিঃ সেন,

আপনাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আমি ঠিক আমার কাজ শেষ করলাম।

আপনারা এখানে আসবেন তা জানতাম। তাই তার আগেই আমরা চলে যাচ্ছি এখান থেকে।

আবার দেখা হবে, আশা করি। তবে তা এখানে নয়—ভারতের অন্য কোনও স্থানে। কিন্তু কোথায় তা আমি বলব না।

আশা করি, এতদিনে বুঝতে পেরেছেন যে মিথ্যা গর্ব আমি করি না। আমার কথা এবং কাজ ঠিকই থাকে। ইতি—

দলপতি, অপরাধী সংঘ।

চিঠিটা পড়ে দীপক স্তব্ধ বিস্ময়ে সেদিকে চেয়ে থাকে।

। চার ।

—মাদ্রাজে দীপক—

মাদ্রাজ শহরের জনবিরল শহরতলীতে একটি ছোট্ট বাড়ি ভাড়া নিয়ে বিখ্যাত রহস্য অনুসন্ধানী দীপক চ্যাটার্জী সম্প্রতি বাস করছে।

কোনও একটি বিশেষ কাজের চাপে পড়ে গোপন উদ্দেশ্যে মাদ্রাজ সরকারের অনুরোধে বর্তমানে তাকে সেখানে বাস করতে হচ্ছে। নিজেকে একেবারে গোপন রেখে আত্মীয় বন্ধুহীন বাড়িতে সে শুধু পুরানো চাকর ভজুয়া এবং সহকারী ও বন্ধু রতনলালকে নিয়ে বাস করছে।

যে লোকটি বা দলের বিরুদ্ধে তার এই সংগ্রাম, সে একদিন সারা এশিয়া অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, বর্মা, ইরান, চীন, প্রভৃতি দেশে একজন কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল বলে পরিচিত ছিল। বর্তমানে মাদ্রাজ পুলিশ তার মাদ্রাজে উপস্থিতি বুঝতে পেরে দীপকের মত খ্যাতিসম্পন্ন গোয়েন্দাকে এই কেসের তদন্তের জন্যে আমন্ত্রণ করে এনেছে। কিন্তু সেই অপরাধী সংঘের দলপতি যে কে, তা তারা বুঝতে পারেনি।

সেদিন রাত তিনটে।

হঠাৎ খুট্ করে শব্দ হতেই দীপকের ঘুম ভেঙে গেল। দীপক ভাল করে তাকিয়ে দেখল, জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে তার সারা

ঘরটাকে যেন আলোর বন্যায় ভরিয়ে দিচ্ছে নৈশ স্তব্ধতায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন।

ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, ঠিক কাঁটায় কাঁটায় রাত তিনটে।

দীপক উৎকর্ণ হলো। নিচের তলার বৈঠকখানা থেকে শব্দ ভেসে এলো। বৈঠকখানা ঘরের দরজা তেমনি তালাবন্ধ আছে। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে দীপক ভেতরে ঢুকল তালা খুলে। টর্চ জেলে দেখতে পেল সবকিছু ঠিক আছে আগের মতই, শুধু একটি ড্রয়ার খোলা। ড্রয়ারের মালপত্র ঘরের মধ্যে ছড়ানো।

কে এইসব কাগজপত্র লণ্ডভণ্ড করল! কি করেই বা ঢুকল সে এই তালাবন্ধ ঘরে?

দীপক ভাবল সে নিজে তালা খোলেনি ত? না, সে ত বন্ধ করেই গেছে এটা। তবে?

হঠাৎ দীপকের চোখে পড়ল জানালাটা খোলা। এ জানালার গরাদ নেই। এটা বন্ধ করা ছিল। কিন্তু খুলল কে?

জানালার ওপাশে ফাঁকা বাগান—তার ওপাশে পথ।

দীপক জানালার কাছে গিয়ে বাগানে টর্চের আলো ফেলল।

ওকি! বাগানের প্রান্তে কালো আলখাল্লা-পরা একটা মানুষের মূর্তি। দৌড়ে বাগান পেরিয়ে পথে গিয়ে নামল সেই মূর্তিটা।

একটি মুহূর্ত, তারপরেই মূর্তিটি অন্তর্হিত হলো।

দীপক ভাবল, ছি ছি, ভুল করে সে পিস্তলটা আনেনি—তাহলে এখান থেকেই গুলি ছুঁড়তে পারত।

ভাল করে জানালা বন্ধ করে দিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে এলো।

* * *

পরদিন সকালে একটু বেলায় দীপকের ঘুম ভাঙল। গত রাতের কথা চিন্তা করতে করতে নেমে এসে ডায়েরীতে সব ঘটনা লিখে

রেখে একটু বিশেষ কাজে বাইরে বের হলো। ফিরে এলো প্রায় এগারোটায়।

চাকর ভজুয়া বললে—পরশু রাতের সেই মেয়েটা এসেছিলেন, বাবু।

—কে, কমলা? তা হঠাৎ—

—আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে বসেছিলেন। এইমাত্র চলে গেলেন।

—আমার একটু দেরী হয়ে গেছে আসতে।

—আচ্ছা দাদাবাবু, কাল রাত ঠিক সাড়ে আটটার সময় আপনি কি কোনও কান্নার আওয়াজ শুনেছেন?

—কই, না ত! দীপক শুনেছিল ঠিকই—তবে কথাটা চেপে গেল, পাছে ভজুয়া ভয় পায়।

রাতের ঘটনার কথাও কিছু বললে না সে। ভজুয়াও সেকথা জানে না। বোধহয়, সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল।

দীপক চিন্তা করল। কয়েক দিন আগেও সে এমনি গভীর রাতে হঠাৎ মেয়েলী কণ্ঠের কান্না শুনেছে। তারপর কাল রাতে দেখল রহস্যময় কালো ছায়া। তবে কি কেউ তার আগমন জানতে পেরে ভয় দেখিয়ে তাকে তাড়িয়ে দিতে চায়? কিন্তু দীপক এত সহজে ভয় পায় না—তা নিশ্চয়ই ওরা জানে না।

দীপক কতকগুলো কাগজপত্র নিয়ে কাজে মন দিল।

বারবার একটা কথা সে ভাবতে লাগল—কে এই কমলা? হঠাৎ তার সঙ্গে যেচে আলাপ করে একটা জরুরী কাজে তার সাহায্য চাইল—অথচ কি কাজ তাও বললে না আজ পর্যন্ত। মেয়েটি জাতে হিন্দু—না ব্রাহ্মণ না পার্শী—তাও তার চেহারা দেখে বোঝা যায় না।

এমন সময় ভজুয়া এসে বললে—মিঃ বাজপেয়ী দেখা করতে এসেছেন।

দীপক চেনে মিঃ বাজপেয়ীকে। বললে—পাঠিয়ে দে।

একটু পরে সুদীর্ঘ-দেহী বলশালী পুলিশ অফিসার মিঃ বাজপেয়ী প্রবেশ করে বললেন—সুপ্রভাত মিঃ চ্যাটার্জী!

—সুপ্রভাত! তা হঠাৎ অসময়ে যে? কি ব্যাপার—আপনার কাজ ঠিকমত এগোচ্ছে তো?

—নিশ্চয়ই। কিন্তু কাল রাতে যা ঘটেছে, আর দু' একটা ঘটনা যা ঘটেছে, তাতে মনে হয় আমার ওপর ওদের নজর পড়েছে।

—কেন বলুন ত?

দীপক আগাগোড়া সব খুলে বললে।

কৌতূহলী হয়ে মিঃ বাজপেয়ী বললেন—যা শুনেছি তা যদি ঠিক হয় তবে স্বয়ং দলপতিই কাল এসেছিলেন। মনে হয়, বিশেষ নজর পড়েছে, তাই অপরাধী সংঘের দলপতি স্বয়ং পদার্পণ করেছিলেন। যাক্, যে জন্যে এলাম আগে তাই দেখুন ত।

মিঃ বাজপেয়ী লম্বা মত একটা ছোট্ট সোনার দণ্ড বের করে দীপকের হাতে দিলেন। তারপর বললেন—এটা কি বলুন ত দীপকবাবু?

দীপক বললে—এটা কি কোন কউরিও?

—না। আপনি তো সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, বলুন তো এমন গহনা কি কোনও দেশের লোক ব্যবহার করে?

—আমি ত তা জানি না।

—এটা হচ্ছে ওই অপরাধী সংঘের প্রতীক-চিহ্ন। ওই দলের প্রত্যেকের কাছে এমনি প্রতীক-চিহ্ন থাকে বলে শুনেছি।

দীপক বললে—সেদিন বড় ব্রীজের নীচে একজন বুড়ো রিক্সাওয়ালা হঠাৎ সন্ধ্যেবেলা একজন লোককে দেখে মাথা নুইয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করে আবার চলতে লাগল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—ব্যাপার কি রে? সে বললে—সাংঘাতিক লোক বাবু, ওরা অপরাধী সংঘের লোক। তাই

শুনে অবধি আমি বুঝেছি, অল্পদিনে এই দেশে ওরা কি রকমভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে।

মিঃ বাজপেয়ী বললেন—এই মাদ্রাজ শহরে যেভাবে পর পর তিনজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী ওদের হাতে প্রাণ দিলেন, তার পরে বাধ্য হয়েই আপনাকে আনা হয়েছে। কিন্তু গতকাল হঠাৎ সমুদ্রের ধারে একটা মৃতদেহ আবিষ্কার করা হয়। আপনাকে এখনো সে বিষয়ে কিছু বলিনি। আজ তার দেহ পোষ্টমর্টেম করে জানা গেল, বিষ দিয়ে লোকটিকে মারা হয়েছে। তার পকেটে এই চিহ্নটি পেয়েছি আমরা—আর সেই সঙ্গে একটি কার্ডে লেখা ছিল—"বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম।" বোধহয় লোকটি পুলিশের ঘোষণা-করা দশ হাজার টাকার লোভে বিশ্বাসঘাতকতা করতে প্রলুব্ধ হয়েছিল।

দীপক বললে—যে লোক অপরাধী সংঘের দলপতিকে ধরিয়ে দেবে, এই যে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, আপনার এতে তাহলে লাভ না হলেও একটি লোক প্রাণ হারাল।

মিঃ বাজপেয়ী বললেন—মুখটি এমন ক্ষতবিক্ষত যে সনাক্ত করবার উপায় নেই। তবে জানা গেছে, লোকটি মুসলমান। সম্ভবতঃ জাহাজের খালাসী ছিল। তার নম্বর ছিল চৌদ্দশত পঞ্চাশ।

এই নম্বর-লেখা একটা চাকতিও লোকটির পকেটে পাওয়া গেছে। অপরাধী সংঘের প্রত্যেক লোকের একটি করে নম্বর থাকে। বোধহয় এটা সেই নম্বর।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল : ক্রিং ক্রিং ক্রিং···

দীপক ফোন তুলে কথা বলে, হ্যালো···

—হ্যালো···মিঃ বাজপেয়ীকে দিন।

—থানা থেকে ফোন করছে—আপনার ফোন।

মিঃ বাজপেয়ী বললেন—হ্যালো···কে? সার্জেন্ট জোন্স? কি খবর?

উল্টো দিক থেকে উত্তর ভেসে এলো—স্যার, যে লোকটা খুন হয়েছে সে খালাসী না।

—তবে কে ?

—গোয়েন্দা হরিহর সিং।

—কি করে জানলে ?

—তাঁর চাকতির নম্বর ছিল ১৪৫। এটা পুলিশের নম্বর। বোম্বের পুলিশ বিভাগ এই রকম চাকতি ব্যবহার করে।

—বুঝেছি। ভেরি স্যাড্ নিউজ। আমরা আর একজন লোককে হারালাম! আচ্ছা, আমি আসছি। বলে, তিনি রিসিভার নামিয়ে রেখে দীপককে বললেন—বোম্বে থেকেও একজন বিখ্যাত গোয়েন্দা অপরাধী সংঘের বিরুদ্ধে কাজ করবার জন্যে এসেছিলেন। তাঁর নাম হরিহর সিং।

দীপক হেসে বললে—অত সহজে ভেঙে পড়বেন না মিঃ বাজপেয়ী।

—কেন ? কোন আশা দিচ্ছেন আপনি ?

দীপক বললে—অপরাধী সংঘের নেতা শক্তিমান হলেও সে মানুষ—দেবত তো আর নয়।

—তা অবশ্য ঠিকই।

—তাই আমি আশা করছি, তার সম্বন্ধে কিছুটা জ্ঞান আমরা দু'চার দিনেই অর্জন করতে পারব।

—দেখা যাক, এখন আপনিই ভরসা। তাহলে আজকের মত চলি।

মিঃ বাজপেয়ী উঠে দাঁড়ালেন।

দীপক আবার চিন্তার সাগরে ডুব দিল।

———

। পাঁচ ।

—রহস্যময়ী কমলা—

মিঃ বাজপেয়ী বেরিয়ে যাবার একটু পরেই একটা কথা দীপকের মনে হলো। ওঁর কাছ থেকে সোনার দণ্ডটা রেখে দিলে তার নিজের কিছুটা সুবিধা হতো। কিন্তু উনি নিশ্চয়ই এখনও ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ড পর্যন্ত যাননি। একটু জোরে পা চালালে হয়ত ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডেই ওঁকে পাওয়া যাবে।

দীপক ভজুয়াকে ডেকে বললে—আমি একটু ট্যাক্সি-ষ্ট্যাণ্ডে যাচ্ছি। এক্ষুণি আসব। তুই এখানে বোস।

দীপক বেরিয়ে জোরে জোরে পা চালায়।

সে বেরিয়ে যাবার একটু পরেই একটা বড় কালো গাড়ি এসে থামল তার বাড়ির সামনে। গাড়ি থেকে নামল মিস্ কমলা।

ভজুয়া তাকে দেখে বসতে দিলে।

—দীপকবাবু কই? একটু বিশেষ প্রয়োজন ছিল।

ভজুয়া বললে—তিনি এইমাত্র বের হলেন, বসুন, এক্ষুণি ফিরবেন।

কমলা বসল।

ভজুয়া তাকে বসিয়ে নিজের কাজে চলে গেল।

ভজুয়া চলে যেতেই হঠাৎ একটা আশ্চর্য কাণ্ড করে বসল মিস্ কমলা। তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে একটা নকল চাবি বের করে টেবিলের ড্রয়ার খুলে ফেলল। তার ভেতর থেকে দীপকের ডায়েরী, চেক-বই ইত্যাদি বের করে সে একপাশে রেখে দিয়ে, কি একটা জিনিস খুঁজতে লাগল।

হঠাৎ মোটা একটা খাম আর গোটা কয়েক কাগজ একসঙ্গে বাঁধা অবস্থায় দেখে সে তাড়াতাড়ি সেগুলো নিয়ে ড্রয়ারটা বন্ধ করতে গেল।

কিন্তু তার কাজ শেষ করতে পারল না।

আচমকা দরজাটা খুলে গেল।

মিস কমলা চমকে তাকিয়ে দেখে, তার সামনে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে স্বয়ং দীপক চ্যাটার্জী।

—এই যে কমলা দেবী!

বলে, হাসিমুখে দীপক কমলাকে অভ্যর্থনা করল।

কিন্তু তার পরেই ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই সে চমকে উঠল। দীপকের মুখভঙ্গি আমূল পালটে গেল।

—একি কমলা দেবী?

দীপক যেন আকাশ থেকে পড়ল। কমলার এরূপ কাণ্ড দেখে সে যে মর্মাহত হয়েছে তা বেশ বোঝা গেল।

সব দেখে কোন কথা বুঝতে দীপকের বাকি রইল না।

কমলার সারা দেহ তখন মৃদু মৃদু কাঁপছে—উত্তেজনায় আর হতাশায় তার মুখ বিবর্ণ।

একটু চুপ করে থেকে দীপক বললে—মিস্ কমলা দেবী, বড় অসময়ে এসে পড়েছি, তাই না?

কমলার মুখ দিয়ে আর কোনও কথা বের হলো না।

দীপক বললে—এতক্ষণে বুঝলাম, তোমার হঠাৎ বিপদে পড়ার রহস্য। তারপর আমি যখন থাকি না ঠিক সেই সময়েই তোমার আবির্ভাব হয়। ভেবেছিলে, আমি খুব দূরে গেছি ফিরতে দেরী হবে—কিন্তু তা হয়নি। যাক্, এখন বল কি কি জিনিস তুমি নিয়েছ! ছি ছি! একজন শিক্ষিতা মহিলা হয়ে তুমি শেষে কিনা একটা হীন চোরে পরিণত হলে!

কমলার মুখখানা লাল হয়ে উঠল লজ্জায়। বললে—আমি কিছু চুরি করিনি, দয়া করে আমাকে ছেড়ে দিন।

—ওসব কথায় ভুলব না। কি কি নিয়েছ, বের করে দাও।

—কিছুই নিইনি, শুধু কাগজগুলো দেখছিলাম।

—ড্রয়ার খুললে কি করে?

—এই চাবিগুলোর একটা ড্রয়ারে লাগে। এগুলো আমার চাবি।

—তা বেশ করেছ, কিন্তু কে তোমাকে একাজে লাগিয়েছে বল ত? তাহলে আমি তোমার বিষয়ে বিবেচনা করে দেখতে পারি।

—সত্যি কথা বললে মুক্তি দেবেন?

—হ্যাঁ, তবে যদি তা সত্য হয়। তোমার কথা শুনলেই বুঝতে পারব, তুমি সত্য বলছ কি মিথ্যা বলছ। কিন্তু তার আগে একটা কথার ঠিক জবাব দাও ত?

—কি কথা?

—কালো আলখাল্লা-পরা একটা লোক আমার বাড়ির আশেপাশে ছায়ার মত ঘুরে বেড়ায়। বল ত সে কে?

ভীতকণ্ঠে কমলা বললে—তিনি···না, না, ও-বিষয়ে কিছু আমি বলতে পারব না।

—ও!

বলে, দীপক ভীত কমলার দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ কি মনে করে মিঃ বাজপেয়ীর এইমাত্র দিয়ে যাওয়া সোনার দণ্ডটা তাকে দেখিয়ে বললে—বল ত, এই জিনিসটি চেনো কি না?

কমলা আবার চমকে উঠল।

দীপক ধীর কণ্ঠে বললে—বুঝেছি, তাহলে কুখ্যাত ক্রিমিনাল দল অপরাধী সংঘের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক আছে।

—না না, সে সম্বন্ধে আমি—

—চুপ কর! সব বুঝেছি। বোম্বের গোয়েন্দা হরিহর সিং তোমার দলের লোকদের হাতেই সম্প্রতি খুন হয়েছেন। তাই তোমায় আমি কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারি না।

—বিশ্বাস করুন—

—কি বিশ্বাস করব?

—আমার মুখ খোলবার উপায় নেই। তবে একটা কথা বলব—বিশ্বাস করবেন?

—বল, শুনি।

—সামনেই আপনার মস্ত বড় একটা বড় বিপদ আসছে!

—তা আমি জানি! তাতে আমি কোনও ভয় পাই না!

—আর আমি এসেছিলাম এই খাম আর কাগজগুলোর জন্যে।

বলেই, কমলা হঠাৎ খাম আর কাগজগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিল ঘরের এক কোণে।

দীপক চমকে উঠলো।

সে তক্ষুণি ছুটে গেল সেগুলো কুড়িয়ে নিতে। আর এই সুযোগে কমলা ঘরের বাইরে দৌড়ে গেল।

দীপক কাগজগুলো তুলেই মুখ ঘুরিয়ে দেখে, কমলা দরজা বন্ধ করে পালিয়ে গেল দীপক দরজার দিকে এগুলো, কিন্তু দরজা বাইরে থেকে শিকল দেওয়া।

দীপক চীৎকার করে ডাক দিলে—ভজুয়া! ভজুয়া!—

ভজুয়া এসে যখন দরজা খুলল ততক্ষণে একটি গাড়ি সশব্দে তাদের বাড়ির কম্পাউণ্ড ছেড়ে দ্রুতবেগে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপক বুঝতে পারল, কমলা পলায়ন করল, আর ওকে অনুসরণ করে ধরা সম্ভব নয়।

। ছয় ।

—জীবন্ত হরিহর সিং—

পুলিশ অফিসার মিঃ বাজপেয়ী থানায় ঢুকেই সার্জেন্ট জোন্সের অনুসন্ধান করে যা শুনলেন, তাতে তাঁর বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

সার্জেন্ট জোন্স থানায় নেই—ঘণ্টা তিন চারেকের মধ্যে তিনি ডিউটিতে আসেননি—তাঁর নাইট ডিউটি, সন্ধার পরে আসবার কথা। তাহলে টেলিফোন করলে কে?

বিমূঢ়ভাবে তিনি পুলিশের কমাণ্ডার অফিসার মিঃ বর্মণের সঙ্গে দেখা করলেন।

মিঃ বর্মণ বললেন—কি খবর মিঃ বাজপেয়ী? কিছু সুরাহা হলো অপরাধী সংঘের কেসের বিষয়ে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু দীপকবাবু আশা দিলেও এখন সময় লাগবে মনে হয়।

—তা ত লাগবেই। তবে তিনি একজন ক্ষেমাস গোয়েন্দা। তাঁর সাহায্যে একটা কিছু সুরাহা নিশ্চয়ই আশা করা যায়।

—আচ্ছা স্যার, শুনলাম সর্বশেষ নিহত ব্যক্তিটি হলেন বোম্বের গোয়েন্দা—

বাধা দিয়ে মিঃ বর্মণ বললেন, আশ্চর্য, আপনি একথা জানলেন কি করে? আমি ছাড়া থানার আর কেউ জানেনা ত!

মিঃ বাজেপেয়ী তখন টেলিফোন সংক্রান্ত বিষয় খুলে বললেন।

সব শুনে মিঃ বর্মণ বললেন, খুব সাবধান মিঃ বাজপেয়ী। মনে রাখবেন টেলিফোনে স্বর অনুকরণ করা এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

—তা ঠিক, কিন্তু যদি শত্রুদলের কেউ ফোন করে, তাতে তার কি স্বার্থ? আর সে কেনই বা—

এমন সময় কথায় বাধা দিয়েটেলিফোন বেজে উঠল।

—হ্যালো···মিঃ বর্মণ ফোন ধরলেন।

মিঃ বাজপেয়ী আছেন? কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

—হ্যাঁ, আছেন।

মিঃ বর্মণ রিসিভারটা দিলেন বাজপেয়ীকে। বাজপেয়ী কথা বলে, রিসিভারটা রেখে বললেন—দীপকবাবু কথা বললেন।

—কি ব্যাপার বলুন তো?

—বললেন, জরুরী কারণে তিনি দেখা করতে চান। আমি চলে আসার পর নাকি অদ্ভুত ঘটনা ঘটে গেছে। আমি বললাম যে দশ মিনিটের মধ্যে আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে।

—বেশ করেছেন, কি জন্যে ডাকছেন জেনে আসুন। ফিরে এসেই আমার সঙ্গে কিন্তু দেখা করে সব কথা বলবেন।

—আচ্ছা স্যার।

মিঃ বাজপেয়ী বেরিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে।

* * *

একটু পরে দীপকের বাড়িতে এসে পৌঁছালেন তিনি। দীপক তাঁকে বসিয়ে বললে, এইমাত্র একটা ঘটনা ঘটে গেল, যার জন্য কতকগুলো জিনিস আমি আপনাদের কাছে জমা রাখতে বাধ্য হচ্ছি। কারণ পুলিশ সেফ্ কাষ্টডি ছাড়া এগুলি রাখা নিরাপদ নয়।

মিঃ বাজপেয়ী বললেন, ঘটনাটা কি তা জানতে পারলে ভাল হতো।

দীপক হেসে বললে নিশ্চয়ই। দিন কয়েক আগে বিশেষ একটা স্থানে আমাকে ছদ্মবেশে যেতে হয়েছিল তদন্ত উপলক্ষে। ফিরতে একটু

রাত হলো। জায়গাটাও যে খুব ভাল তা নয়। ট্যাক্সি নিলাম। ট্যাক্সির ড্রাইভার আমার সঙ্গে যেতে আশঙ্কা করল। তারপর কথায় কথায় সে হঠাৎ বললে—বাবু, আমি আপনাকে চিনি—কাগজে আপনার ছবি দেখেছি অনেক।

আমি হেসে বললাম—আমি ত ছদ্মবেশে আসছি। তবু যে তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ, তাতে তোমার দৃষ্টিশক্তির প্রশংসা করতে হয়।

আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে ভাড়াটা নিয়ে সে কিন্তু চলে গেল না। বললে—বাবু, আপনার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে। একটু গোপনীয়।

আমি তাকে ভেতরে এনে বসালাম। সে একটি চামড়ার ছোট ব্যাগ আমার হাতে দিয়ে বললে—ক'দিন আগে এটা আমি গাড়িতে কুড়িয়ে পেয়েছি। কোনও বাবুর জিনিস। কিন্তু বিশেষ কারণে আমি এটা থানায় জমা দিচ্ছি না—আপনার কাছে রেখে যাচ্ছি, পরে এসে নিয়ে যাব। আর যদি কখনো শোনেন যে আমি মারা গেছি, আপনি তালা ভেঙে জিনিসটা দেখতে পারেন। আমি তার কথামত জিনিসটা ড্রয়ারে রেখে দিলাম। আসলে সেটা ছিল চামড়ার ব্যাগে বন্ধ একটি খাতা। ব্যাগশুদ্ধ সেই খাতাটা আজও আমার কাছে আছে। এই বলে দীপক ব্যাগটা বের করে এনে মিঃ বাজপেয়ীর হাতে দিল।

দীপক বললে—ক'দিন আগে কমলা নামে একটা মেয়ে হঠাৎ আমার সঙ্গে দেখা করে বললে যে, সে জানতে পেরেছে আমি খ্যাতনামা গোয়েন্দা—তাই বিপদে সে আমার সাহায্য চায়। আমি ব্যস্ত ছিলাম বলে তাকে পরে আসতে বলি। আজ আমি যখন আপনার সঙ্গে দেখা করতে ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডে গেলাম, তখন সে হঠাৎ এসে আমার ঘরে ঢুকল। ভজুয়া তাকে বসতে দিল।

তারপর চাকরের অজ্ঞাতে সে নকল চাবি দিয়ে ড্রয়ার খুলে ফেলেছিল

ওই ব্যাগটা চুরি করার মতলবে। অপরাধী সংঘের তদন্ত সম্পর্কিত কতকগুলি কাগজপত্রও চুরি করে পালাতে চেষ্টা করে।

এই বলে, কমলা এবং কালো-পোশাক-পরিহিত লোকটির বিষয়ে সব কথা বর্ণনা করল দীপক।

সব শুনে মিঃ বাজপেয়ী বললেন—তাহলে খাতাটি যে অপরাধী সংঘের সম্পত্তি, তাতে সন্দেহ নেই। আচ্ছা, ড্রাইভারটির বয়স কত হবে বলে মনে করেন?

—পঁয়ত্রিশ কি ছত্রিশ হবে।

—কোন্ দেশীয়?

—ভারতীয়। তবে পাঞ্জাবী, না মুসলমান, না পার্শী—তা বলা অসম্ভব। অবশ্য তার পাঞ্জাবীদের মত দাড়ি-গোঁফ ছিল।

—মেয়েটা কোন্ দেশীয়?

—সেও ভারতীয়, তবে বাংলা বললেও বাঙালী মনে হয় না। তার কথার মধ্যে অবাঙালীর টান ছিল।

—আচ্ছা, যে জায়গায় আপনি তদন্তে গিয়েছিলেন সেটা কোথায়?

—একটা রেষ্টুরেন্ট। সব রকমের লোকই ওখানে আনাগোনা করে।

মিঃ বাজপেয়ী ব্যাগটি আর কাগজপত্রগুলি নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

* * *

সেই দিনই বিকালবেলা।

সন্ধ্যা হতে কিছুটা দেরী ছিল তখনো।

একটা কাজে দীপক খুব ব্যস্ত হয়ে দুপুর থেকে ছুটে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু যে লোকটির সন্ধানে সে এত তন্ন তন্ন করে মাদ্রাজ শহর তোলপাড় করছে, তার দেখা কোথাও মিলল না।

একটু হতাশ মনেই দীপক রাজপথ ধরে আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছিল। এমন সময় একটা ট্যাক্সি তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

দীপক দেখল, ট্যাক্সিতে চালক ছাড়া আরও একটি যাত্রী রয়েছে, আর সে হল কমলা। কমলা তাকে দেখে কিছুটা দূরে ট্যাক্সি থামাল তারপর হাত নেড়ে ইশারায় তাকে ডাকল।

দীপক ভাবলে, কমলাকে ধরে যদি কোনও সন্ধান মেলে। সে তাই সেদিকে এগিয়ে চলল।

কিন্তু সে দু' এক পা এগোতেই হঠাৎ ট্যাক্সিটা তাড়াতাড়ি চলতে সুরু করল।

দীপক বিস্মিতভাবে চেয়ে দেখলো, কমলা কি একটা জিনিস ট্যাক্সি থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ট্যাক্সি নির্দিষ্ট গতিতে ছুটে চলে গেল।

দীপক জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখতে পেল, সেটা একটা বড় কাগজ তালগোল পাকিয়ে জড়ানো। আর তাতে লেখা :

'রাতে সাবধানে জানালাগুলো সব বন্ধ করে শোবেন! আর আমাকে একেবারে মন্দ বলে ভাববেন না।'

ট্যাক্সিটা ততক্ষণ বহুদূরে চলে গেছে। সেখানে কোন ট্যাক্সিও ছিল না যে তাকে অনুসরণ করে ধরতে পারবে।

বাধ্য হয়ে, দীপক বাড়ির দিকে ফিরে চলল।

সারাটা পথ দীপক চিন্তা করতে করতে চলল। কে এই রহস্যময়ী নারী? অপরাধী সংঘের সঙ্গে তার কি-ই বা সম্পর্ক? কেন-ই বা সে তাকে সাবধান করে দিল?

তারপর এতগুলি নরহত্যাই বা কেন করে চলেছে অপরাধী সংঘের দলপতি?

রতনগড়ের প্রিন্সকে অপরাধী সংঘ হত্যা করেছে—তার পিছনে কারণ ছিল। প্রিন্সের চরিত্রহীনতা দোষ ছিল। কিন্তু তারা তিন চারটি

হত্যার কারণ খুঁজে পায়নি। আর সবচেয়ে আশ্চর্য হলো হরিহর সিংয়ের হত্যাকাণ্ড। এটা যেন অকল্পনীয় ব্যাপার।

* * *

ভাবতে ভাবতে দীপক যখন বাড়ি ফিরল তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে—পৃথিবীর বুকে অন্ধকারের ম্লান ছায়া।

—ভজুয়া, ও ভজুয়া—

দীপক চাকরের নাম ধরে ডাক দিল। সারাটা বাড়ি আঁধারের আড়ালে আত্মগোপন করে বসে আছে যেন। ভজুয়া দরজা খুলল। আলো পড়ল দীপকের চোখে।

দীপক বললে—কি রে, দরজা বন্ধ করে বসে কেন?

ভজুয়া বললে—বাবু, এমন নিরালা জায়গায় ঘর নিয়েছেন যে গা যেন ছম্ ছম্ করছিল। একবার জানালা দিয়ে দেখলুম কে একটা লোক যেন বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কি একটা অস্পষ্ট দুর্বোধ্য শব্দও কানে গেল। কে যেন সুর করে কি বলছে। শব্দটা একটু পরে থেমে গেল। তাই দরজা বন্ধ করে বসে আছি।

—দূর, তুই বড় ভীতু।

কিন্তু দীপক মুখে তা বললেও, মনে মনে নানা কথা চিন্তা করতে লাগল। ভাবতে লাগল, কমলার দেওয়া চিঠিটার কথা।

তাকে সাবধান করেছে কমলা। কিন্তু কেন? সত্যিই কি শত্রুদের কেউ আসবে তাকে হত্যা করতে? কে জানে কি হবে।

পৃথিবীর বুকে গাঢ়তর হয়েছে আঁধার

দীপক ঘরে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর ভজুয়াকে খাবার আনতে বললে।

খাওয়া শেষ করে হঠাৎ মনে হলো গত ক'দিনের সব ঘটনা সে ডায়েরীতে লিখে রাখবে, আর জানালাগুলোও বন্ধ করে দেবে।

কমলার কথা অস্বীকার করা উচিত নয়। এমন সময় হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন।

দীপক পাশের ঘরে গেল টেলিফোনের শব্দ শুনে। কিন্তু ফোনের কাছে পৌঁছবার আগেই সে আকস্মিকভাবে কার্পেটে পা বেধে পড়ে গেল। উঠে দাঁড়াবার আগেই দপ্ করে এক ঝলক আলো ঝলসে উঠল। কি একটা পোড়ার গন্ধ ভেসে এলো, আর চট চট শব্দ হলো! সারা ঘর বিশ্রী এক দুর্গন্ধে ভরে উঠল।

দীপক দেখল, টেলিফোনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে—টেলিফোন গাইডটাও জ্বলছে। ভাগ্যিস সে পড়ে গিয়েছিল, তা না হলে অদৃশ্য হাতের নিক্ষিপ্ত আলোক-রশ্মিতে সে পুড়ে মারা যেত। সৌভাগ্যক্রমে সেটা তার গায়ে না লেগে লাগল টেলিফোনে।

এদিকে বাইরে দু'বার পিস্তলের গর্জন শোনা গেল—গুড়ুম! গুড়ুম!

কে যেন আর্তনাদ করে উঠল। তারপর আর কোনও শব্দ শোনা গেল না।

একটু পরে একটা লোক ছুটে এসে ঘরে ঢুকল। তার হাতে পিস্তল।

হতভম্ব দীপক কিছু বলার আগেই সে বললে—ইস্, ফোনটা পুড়ে গেছে। তাহলে ত কোন উপায়ই নেই। আবার ওরা পালাল।

দীপক বললে—আপনি কে?

লোকটি হেসে বললে—আমি আপনাকে বাঁচাবার জন্যে ওদের দিকে তাক করে পিস্তল ছুঁড়েছি। বোধহয় ওদের একজনের গায়ে গুলি লেগেও থাকতে পারে। যাই হোক, ওরা পালিয়েছে—তবে আপনার ভাগ্য ভাল যে রশ্মিটা গায়ে লাগেনি।

—কিন্তু আপনার নাম কি তা জানতে পারলাম না আমি।

—আমারই নাম গোয়েন্দা হরিহর সিং।

—মিথ্যে কথা!

—কেন ?

—আপনার মৃতদেহ ত পুলিশ মর্গে দেখলাম।

—না, প্রাণের দায়ে আমিই তাকে মারি। সে অপরাধী সংঘের লোক। আমি বাধ্য হয়ে আমার নম্বরের চাকতি তার পকেটে ঢুকিয়ে দিই—তাতে শত্রুপক্ষ জানে, আমি মারা গেছি। কিন্তু তবুও ওদের ধরতে পারলাম না।

—আপনি এতক্ষণ ছিলেন কোথায় ?

—আপনার বাড়ির পেছনে একটা গাছে সন্ধ্যা থেকেই ছিলাম। আমি জানতাম, আপনাকে হত্যার চেষ্টা করবে তারা।

—কিন্তু ঐ মারাত্মক রশ্মি ওরা কোথায় পেল ?

—ওটা অপরাধী সংঘের নিজের আবিষ্কার নয়। একজন বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে পেয়ে, পরে তাকে মেরে ফেলে।

দীপক একটু ভেবে বললে—আপনাকে যেন আর কোথায় দেখেছি।

লোকটি হেসে বললে—হ্যাঁ, আমিই দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে ড্রাইভার সেজেছিলাম। আমিই ব্যাগশুদ্ধ খাতা জমা দিয়ে যাই আপনার কাছে, ওটা আমার নিজের ডায়েরী। অপরাধী সংঘের অনেক কথা তাতে লেখা আছে।

—কাল তাহলে আমি ওটা দেখব।

—কাল নয়, আজই।

—কেন ?

—আপনারা ওটা পড়ে নিন। তারপর আজ রাতেই একটা অভিযানে বের হবো।

—বেশ, চলুন তবে।

—ভয় পাবেন না ত ?

দীপক হো হো করে হেসে উঠল কথাটা শুনে।

———

—জোহরা বাঈ—

। সাত ।

যখন প্রখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ হরিহর সিং জীবিত বলে দেখা গেল, তখন মিঃ জোন্স আর মিঃ বাজপেয়ী দুজনের মনই আনন্দে ভরে উঠল।

অপরাধী সংঘের বিষয়ে সব তথ্য লেখা ছিল ডায়েরীটাতে, তা ফেরত দিলেন তাঁকে মিঃ বাজপেয়ী।

তারপর বললেন—একটা কথা মিঃ সিং।

—বলুন ?

—আপনি যে যে ঘটনা আজ অবধি তদন্ত করে জানতে পেরেছেন, তা দয়া করে আমাদের বলবেন কি ?

—নিশ্চয়ই।

—তাহলে ধীরে ধীরে সব বলুন।

তখন সব ঘটনা মিঃ সিং বলতে লাগলেন :

অপরাধী সংঘ যে কতটা বিরাট ও ভয়াবহ দল, তা কল্পনা করাও যায় না। ওদের অসাধ্য কোন কাজ আছে বলে জানি না আমি।

প্রথম থেকেই সুরু করছি আমি।

রতনগড়ের প্রিন্সকে নিয়ে এই কাহিনীটি সুরু হচ্ছে।

—আমি তখন বোম্বের পুলিশ বিভাগের ছোট একটা কেসের তদন্তে নিযুক্ত ছিলাম। হঠাৎ ওই সময়ে শুনতে পেলাম যে, রতনগড়ের বিলাসী কুমারবাহাদুর এসেছেন বোম্বেতে। তিনি এসেই একটি বিদেশিনী

নর্তকীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। নর্তকীটি নাকি পুলিশের চোখে সন্দেহ-ভাজন—কারণ, চিত্র-প্রযোজকরা মোটা টাকার চেক লিখে দিতে রাজী হলেও তাকে কাজ করাতে পারেননি—অথচ একটা থিয়েটারে সে নিয়মিত নৃত্য প্রদর্শন করে। তখন আমি তার ওপর নজর রাখি।

কুমার সাহেবের একটি নিজস্ব বেয়ারা ছিল, তার নাম মংলু। ছদ্মবেশে আমি মংলুর সঙ্গে আলাপ জমালাম। তার মুখে শুনলাম,নর্তকীর নাম জোহরা বাঈ। জোহরা বাঈ তখন বোম্বের বিলাসী-মহলে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। কিন্তু ওই রূপসী নর্তকীর ভক্তেরা তার সঙ্গ পাওয়া ত দূরের কথা, তার দর্শনলাভ করতেও পারে না—তাই তার রহস্যময় জীবনকথা নিয়ে নানা কথা শোনা যায়।

জোহরার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু দু'বার চেষ্টা করেও আমি বিফল হলাম, জোহরার দেখা পেলাম না।

জোহরা একটা হোটেলের ফ্ল্যাটে থাকে। শহরের শ্রেষ্ঠ রঙ্গালয়ে তার নাচ দেখানো হয়। ঢাকা গাড়িতে করে সে রঙ্গালয়ে যায়, আবার সেই গাড়ি করেই ফিরে আসে। কারও সঙ্গে দেখা করে না।

শুধু মাঝে মাঝে অর্থাৎ ছুটির দিনে কিংবা সকালে সে একা জুহু বীচ কিংবা মালাবার হীলসে ভ্রমণ করে। সেই সময় সে একাই যায়, সঙ্গে থাকে মোটরচালক করিম। আমি তখন করিমের দিকে নজর রাখবার জন্যে এক অনুচরকে নিযুক্ত করলাম।

কয়েক দিনের মধ্যেই খবর পেলাম, শহরের বাইরে একটি নিম্নশ্রেণীর চা দোকানে করিমের গতিবিধি আছে। সেই চা-খানায় গোপনে মদও বিক্রি হয়। সেখানে বহু গুণ্ডা বদমাইস মিলিত হয় বলে চা-খানাটি কুখ্যাত। কিন্তু সেখানে করিম যায় কেন? শুধু কি পানভোজন করতে?

সেদিনও আমি অন্যদিনের মত খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ও ময়লা

জামা-কাপড় পরে ছদ্মবেশে সেখানে চা পান করছিলাম—হঠাৎ একটা কথা কানে ভেসে এল।

একজন আগন্তুক হোটেলের মালিক ভকত সিংকে বলছে—তুমি কি এই চা-দোকানের মালিক ?

ভকত সিং বললে—হ্যাঁ।

—আমি অপরাধী সংঘ থেকে আসছি। দলপতি পাঠিয়েছেন।

—বলুন তাঁর কি আদেশ ?

—করিম এখানে এসেছে ?

—না, এখনো আসেনি।

—দেখা হলে তাকে বলে দিও, মালিক তার সঙ্গে দেখা করতে চান।

বলেই, ফিস্ ফিস্ করে আরও দু' একটা কথা বলে লোকটা বেরিয়ে যায়।

আমি বুঝতে পারলাম, জোহরার ড্রাইভার করিম অপরাধী সংঘ নামে কুখ্যাত দস্যুদলের সঙ্গে যুক্ত। শুধু যুক্ত নয়, তার হুকুমও মেনে চলে।

এদিকে ফিরে এসে সেদিন কুমার সাহেবের বেয়ারা মংলুর কাছে শুনতে পেলাম, পরদিন জোহরা জুহু বীচে যখন বেড়াতে যাবে সে সময় কুমার সাহেব গোপনে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করবেন এবং প্রেম নিবেদন করবেন।

পরদিন ভোরবেলা ভিখারীর ছদ্মবেশে জুহু বীচে বসে ভিক্ষা করতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই একটা বড় গাড়ি এসে থামলো। গাড়ি থেকে নামল জোহরা। ওড়নায় মুখ ঢাকা থাকতো কিন্তু আজকে সে ঘোমটা খুলে বেড়াতে লাগল। দেখলাম, সত্যিই সে অপরূপ সুন্দরী। একটু

দূরে গাড়িতে বসে রইল ড্রাইভার। জনসাধারণ জোহরার যে চেহারা কোনদিন দেখতে পাননি, আজ আমি ভাগ্যক্রমে তা দেখতে পেলাম।

কিন্তু একটু পরেই দেখা গেল উল্টোদিকের পথ ধরে কুমার সাহেব হঠাৎ এগিয়ে এলেন।

জোহরা তাঁকে দেখে চমকে উঠল। কুমার সাহেব কিছু না বলে জোর করে তার কাছে গিয়ে হঠাৎ তার হাতখানা চেপে ধরে গদ-গদ ভাষায় প্রেম নিবেদন করতে থাকেন।

জোহরা হঠাৎ ডাক দিল—করিম!

সঙ্গে সঙ্গে করিম ছুটে এসে বাঘের মত কুমার সাহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

আমি চেয়ে আঁতকে উঠলাম! করিমের হাতে চকচকে ধারাল একটা ছোরা। তার চোখে মৃত্যুর ভয়াবহতা।

কিন্তু কুমার সাহেবকে ছোরা মারার আগেই জোহরা আবার ডাক দিল—করিম!

করিম জোহরার আদেশ শুনে ভূতলশায়ী কুমার সাহেবকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

অপমানিত ও লাঞ্ছিত কুমার সাহেব উঠে দামী রুমাল দিয়ে গা-হাত-পা মুছতে মুছতে চলে গেলেন। শুধু বললেন—আচ্ছা, দেখা যাবে।

চেয়ে দেখলাম, তাঁর বাঁ-হাত একটু কাটা। একটু পরেই জোহরা গাড়িতে উঠে অদৃশ্য হলো।

আমি সামান্য গরীব ভিখারী বলে আমাকে সকলেই অবজ্ঞা করলো ফলে, আমি হলাম এই সব ঘটনার নীরব সাক্ষী।

সেদিন সন্ধ্যায় রঙ্গালয়ে আবার জোহরার নাচ ছিল।

আমিও অন্য বেশে গেলাম সেখানে নাচ দেখতে। দেখলাম, ঠিক

সামনের সারিতে উচ্চমূল্যের টিকিট কেটে কুমার সাহেবও উপস্থিত আছেন।

একটু পরে ঘণ্টাধ্বনি হতে পর্দা উঠে গেল, জোহরাকে দেখা গেল না।

ম্যানেজার হাতজোড় করে ক্ষমা চেয়ে বললেন—আজ জোহরা দেবী নাচতে পারবেন না। অসুস্থ তিনি। তাঁর পরিবর্তে নাচবেন মিস্ লিলি।

সারা থিয়েটারে বিস্ময়ের গুঞ্জন ধ্বনিত হলো।

ধীরে ধীরে গুঞ্জন কলরবে পরিণত হলো সবাই চীৎকার করে উঠল: টাকা ফেরত চাই।

ম্যানেজার বললেন—তিনি সুস্থ হলেই আবার নাচ দেখাবেন। তার আগে অসম্ভব।

একটু বাদে নৃত্য শুরু হয়ে গেল।

আমি হল থেকে বেরিয়ে এসে হলের মালিককে আমার পরিচয় দিয়ে জোহরার বিষয় জানতে চাইলাম। কিন্তু জোহরা সেই দিনই বোম্বে ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ তা জানে না।

আমি বিমূঢ় হলাম।

এদিকে সেই দিনই থিয়েটার হলে কুমার সাহেব মারা যান। বিষক্রিয়ায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু সন্দেহজনকভাবে কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

আমার সন্দেহ হয়েছিল সেই হোটেলের মালিক ভকত সিংকে, অপরাধী সংঘের দলপতি আর করিমকে।

কিন্তু জোহরার সাথে সাথে করিমও আশ্চর্যজনকভাবে বোম্বে শহর থেকে নিখোঁজ হয়েছিল।

কুমার সাহেবের মৃত্যুতে সারা বোম্বে শহরের প্রতিটি লোকের মুখে অপরাধী সংঘের কথা ঘুরে-ফিরে বেড়াতে লাগল। আমি নিপুণভাবে তদন্ত করলাম—কিন্তু কোন ফল হলো না।

বোম্বে পুলিশ অপরাধী সংঘের দলগত বলে কাউকে সন্দেহ হলেই গ্রেপ্তার করতে মনস্থ করল।

আমার কিন্তু ধারণা ছিল, সেই চা-দোকানের মালিক ভকত সিং ওই সংঘের লোক। আমি তাই গোপনে সেই দোকানের ওপর নজর রাখলাম।

কোণের টেবিলে চারজন পাঞ্জাবী ভদ্রলোক আর একটি মেয়ে জুয়া খেলা নিয়ে ব্যস্ত ছিল। ওপাশে একটা টেবিলে কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল মদন সিং বসে বসে মদ খাচ্ছিল।

আর সবচেয়ে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করল চৌকো চোয়ালযুক্ত একটি লোক। এমন শয়তানী মাখানো মুখ আমি জীবনে দেখিনি। আমি তাকে 'চৌকো-চোয়াল' বলেই অভিহিত করব।

হঠাৎ দেখতে পেলাম মদন সিং টলতে টলতে উঠে পাঞ্জাবীদের পাশে উপবিষ্টা মেয়েটির দিকে তাকাল।

মেয়েটি তাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে একটি পাঞ্জাবী উঠে তাকে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিল।

সে পড়ে গিয়ে একটা বিরাট ছোরা বের করল। ওপাশের লোকটিও ছোরা বের করল পকেট থেকে।

মুহূর্তেই খুনোখুনি হয়ে যেত। কিন্তু হঠাৎ দোকানের মালিক ভকত সিং এসে মদনকে বাধা দিল। অন্য পাঞ্জাবীটি ছোরা হাতে দূরে দাঁড়িয়ে রইল।

একটা প্যাঁচে সে মদন সিংয়ের মত লোককে কাবু করে দোকান থেকে বের করে দিলে।

এদিকে পাঞ্জাবীটির সামনে মেঝেয় কি একটা জিনিস চকচক করছিল। আমি উঠে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে দেখি, একটা সোনালী রংয়ের ছোট্ট দণ্ড—চার ইঞ্চির মত লম্বা।

লোকটি হঠাৎ এটা দেখে বলে উঠল—এটা আমার।

আমি বললাম—হ্যাঁ, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পড়ে গিয়েছিল। এই নিন।

ভকত সিং এসব দেখে বললে—তোমার জিনিস সাবধানে রেখো বুঝলে?

দুজনে ইশারায় চোখে চোখে কি যেন বললে তা আমি বুঝতে পারলাম না। আমি দাম চুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে।

কিছুটা গিয়ে দেখি, দোকানের সেই চৌকো-চোয়াল, ভকত সিং আর পাঞ্জাবী তিনজন আমার দিকে সন্দেহাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে-আছে।

আমাকে ওরা তখন অনুসরণ করছে বলে বুঝতে পারলাম না। কিন্তু পরদিন বুঝলাম, আমি ওদের নজরের বাইরে যেতে পারিনি।

পরদিন বিকেল।

আমি পুলিশ অফিসে গিয়ে বসলাম—বিশেষ কাজে বাইরে যাচ্ছি, প্রয়োজন মত যোগাযোগ করব। আমার ধারণা হয়েছিল, অপরাধী সংঘের মাথারা সকলে এবার বাইরে যাবে। বোম্বেতে ওরা নিরাপদ মনে করছে না।

আমার ধারণা ঠিক।

পরদিন ষ্টেশনে গিয়ে দেখি চার-পাঁচজন লোকের সঙ্গে সেই চৌকো-চোয়াল ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস ষ্টেশনে এসেছে। আমি ছদ্মবেশী ছিলাম বলে আমাকে ওরা চিনতে পারেনি।

ওদের সঙ্গে আমিও ট্রেনে উঠলাম। পাশের কম্পার্টমেন্টেই আমি ছিলাম। দূর থেকে ওদের ওপরে নজর রেখে চললাম।

বোম্বে থেকে পৌঁছলাম এসে সুদূর এই মাদ্রাজে।

চৌকো-চোয়াল যে ওদের দলের একজন প্রধান লোক তা তখনই বুঝতে পারলাম।

মাদ্রাজ ষ্টেশনে নেমে ওরা ট্যাক্সি নিল।

কিন্তু কিছুটা গিয়েই ট্যাক্সি একটা বিরাট হোটেলের সামনে থামল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে চৌকো-চোয়াল ভাড়া দিল না। তার বদলে তাকে একটা অপরাধী সংঘের দণ্ড দেখালো, আর সঙ্গে সঙ্গে সে সেলাম ঠুকে চলে গেল।

আমি ভাবতে লাগলাম, সারা ভারতজুড়ে এই অপরাধী সংঘের কি অপ্রতিহত প্রভাব! আমি সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠলাম ওদের বিরাট ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে।

* * *

আমি মাদ্রাজে থাকলেও ওপরের ঘটনার পর প্রায় একটি মাস আমাকে আর দেখা গেল না। আমি শহরের বাইরে এক বিধবা মহিলার বাড়ির একতলার দুটি ঘর ভাড়া নিয়ে নির্জনে বাস করতে লাগলাম। দিনে বাড়ি থেকে বের হতাম না—রাতে জিনিস-পত্র কিনে আনতাম। বোম্বে পুলিশের-সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ ছিল শুধু। একদিন জানতে পারলাম, সেই কুখ্যাত ক্রিমিন্যাল মারা গেছে কোনও গুপ্ত শত্রুর হাতে। ভকত সিংকে সন্দেহ করেও কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

মাসখানেক পরে আমার নিজেরই বড় বড় আসল দাড়ি-গোঁফ গজিয়ে গেল। তখন আমি পথে বের হলাম।

বেশভূষা এমন হলো যে, আমি তখন পুরোপুরি একজন পাঞ্জাবী ড্রাইভার। আমাকে দেখলে কোনও লোকই পাঞ্জাবী ছাড়া ভাবতে পারতো না তখন। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক ছদ্মবেশ নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত মনে পথে বের হলাম।

একজন মালিকের কাছ থেকে একটি গাড়ি নিয়ে নিলাম ভাড়ায়।

আমার ছদ্মবেশ কেউ ভেদ করতে পারবে না বলেই আমার ধারণা হলো তখন।

* * *

আমি ট্যাক্সি ড্রাইভারের ছদ্মবেশে অপরাধী সংঘের খোঁজে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

আমার মনের মধ্যে একমাত্র চিন্তা—অপরাধী সংঘকে ধরতেই হবে।

বহু কুখ্যাত হোটেলে রোজ রাতে আমি খাবার খেতাম, যাতে অপরাধী সংঘের কোনও লোকের সন্ধান পাই।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটা হোটেলে আমি চৌকো-চোয়ালকে দেখতে পেলাম। দেখলাম, সে একটা হোটেলে বসে মদ খাচ্ছে।

আমিও তার পাশের টেবিলে বসে পড়লাম।

চৌকো-চোয়াল আমাকে খেয়াল করল না। কারণ, আমার ছদ্মবেশ ভেদ করে তখন আমাকে চেনা সম্ভব ছিল না।

সময় কাটতে লাগল।

বেয়ারা এলো একটু পরেই। বললে—আপনার কি চাই বাবুজী?

—মদ এক বোতল আর সোডা।

একটু পরেই বেয়ারা মদ আর সোডা নিয়ে এলো।

আমি গ্লাসে সামান্য একটু মদ আর সোডা ঢেলে খাওয়ার ভাণ করতে লাগলাম।

একটু পরে চৌকো-চোয়াল আমার দিকে তাকাল। বললে—সর্দারজীর আজ ভালই দু'পয়সা উপার্জন হয়েছে বুঝি?

—তা বটে। গুরুজীকো মেহেরবান, আজ ভালই উপার্জন হয়েছে। তা বাবুজীর কি এক পাত্র চলবে নাকি?

—তা চলবে। দিন—

আমি তাকে এক পাত্র দিলাম। তারপর আর এক পাত্র। এমনি করে তিন পাত্র দিতেই বোতল শেষ হয়ে গেল।

আমি বললাম—আর খাবেন বাবুজী ?

সে কিছু বলবার আগেই বাইরে ঘন ঘন মোটরের হর্ণ বেজে উঠল।

আমি কিছু বলবার আগেই ব্যস্তভাবে চৌকো-চোয়াল বেরিয়ে গেল।

সোজা পথে নেমে গেল সে। বুঝলাম হর্ণ দিয়ে ইংগিতে কেউ তাকে ডেকেছে। তবে সে আমার ছদ্মবেশ ভেদ করে আমাকে চিনতে পারেনি।

আমিও বাইরে বের হলাম। গাড়ি নিয়ে চললাম বাড়ির দিকে। মনে হলো, একটা গাড়ি যেন আমাকে অনুসরণ করছে দূর থেকে।

আমি তখন গাড়ি দাঁড় করিয়ে ঢাকা খুলে গাড়ি মেরামত করার অছিলায় দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন আমার গাড়ি খারাপ হয়ে গেছে।

একটু পরেই দেখলাম, চৌকো-চোয়ালদের গাড়িটা আমার গাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। দেখলাম, গাড়িতে দু'তিনজন লোকের সঙ্গে চৌকো-চোয়ালও বসে রয়েছে। তবে আমাকে তারা চিনতে পারেনি ছদ্মবেশের জন্য। তারা পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

আমি সেদিন মালিকের বাড়ি গিয়ে গাড়ি জমা দিয়ে দিলাম—আর পথে বেরোলাম না।

* * *

পরদিন গাড়ি নিয়ে বের হলাম। ঠিক সন্ধ্যা নাগাদ আবার সেই হোটেলে গিয়ে দেখি চৌকো চোয়াল বসে আছে।

সে বললে—আজও এসেছেন দেখছি।

—হ্যাঁ।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—এক পাত্র চলবে নাকি ?

—না। আজ খাবো না আর।

চৌকো-চোয়ালের কণ্ঠস্বর দৃঢ় বলে মনে হলো।

আমি তখন তাকে বললাম—কাল আপনি চলে যাবার পর গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে একটা বড় বিপদে পড়ে গেছিলাম।

—কি রকম ?

—দেখি, কারা যেন আমাকে ফলো করছিল। অথচ আমার কাছে মূল্যবান অনেক কাগজ ছিল।

—কিসের কাগজ ?

—একটা দলের বিরুদ্ধে অনেক খবর। একজন সরকারী লোক বলেছিল কাগজটা পৌঁছে দিলে আমাকে অনেক পুরস্কার দেবে।

—কোন্ দল সেটি ?

—তা জানি না। তবে এটুকু জানি যে তারা ভারত-বিখ্যাত একটি দল

—আপনি আশ্চর্য ট্যাক্সি-ড্রাইভার তো।

—তা বলতে পারেন।

একটু পরেই চৌকো-চোয়াল বেরিয়ে চলে গেল। আমি বের হলাম আরও পরে।

ওই দিনই দীপকবাবুকে দেখেছিলাম ঐ হোটেলে বসে থাকতে। আমি তাঁকে চিনতে পারি এবং তাঁর হাতে ডায়েরীটা অর্পণ করি।

ফেরার পথে আমি মোড়ে আক্রান্ত হলাম হঠাৎ। তবে যার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হলো, সে-ই মারা গেল আমার হাতে। আমি তখন বাধ্য হয়ে তার পকেটে আমার নম্বরের চাকতিটা গুঁজে দিলাম—যার ফলে রটে গেল যে আমি মারা গেছি।

এইভাবে কাজ শেষ করে আমি অদৃশ্য হলাম।

সেইদিন আমি দূর থেকে লক্ষ্য করলাম যে, কমলা নাম নিয়ে দীপক-বাবুর বাড়িতে যাতায়াত স্থরু করেছে জোহরা বাঈ।

কি ব্যাপার তা জানতাম না।

জানলাম পরদিন।

দীপকবাবুর উপর এদের নজর পড়ল। আমি মারা গেছি ভেবে তারা নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু দীপকবাবুকে ত রক্ষা করতে হবে। তাই আমি লুকিয়ে তাঁর উপরে নজর রাখতে সুরু করলাম।

আমি জানতে পারলাম জোহরা আর তার ড্রাইভার করিম দুজনেই মাদ্রাজে এসেছে।

আমিও সাবধানে অনুসরণ করে চললাম।

তারপর দীপকবাবুর বাড়িতে সেদিন যা ঘটেছে তা ত দীপকবাবু জানেন।

অল্পের জন্যেই তাঁর প্রাণ রক্ষা পেয়েছে। কেবল টেলিফোনটি পুড়ে গেল।

তবে একটা জিনিস আমি জানতে পেরেছি যে এদের একটি গোপন ঘাঁটি আছে। সেটির পথ-ঘাট আমি চিনি।

মিঃ হরিহর সিং-এর কাহিনী শেষ হলো।

সকলে তাঁর কথা শুনে উৎকণ্ঠিত ও বিচলিত হয়ে উঠল।

দীপক বললে—সত্যি মিঃ হরিহর সিং, আপনার কার্য-পদ্ধতি অদ্ভুত, সুন্দর ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে বটে।

মিঃ বাজপেয়ী তাঁর কাজের প্রচুর প্রশংসা করলেন।

দীপক ও কমল।

॥ নয় ॥

হরিহর সিং বললেন সেই রাতেই এদের গোপন আড্ডায় হানা দিতে। কিন্তু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে দীপক মত পালটাতে বাধ্য হলো।

রাত প্রায় দুটো বজে গেছে। এত রাতে অচেনা স্থানে গিয়ে কোথায় অপরাধী সংঘের দলপতি বা তার দলবল আছে তা স্থির করা অসম্ভব হবে। তাছাড়া তাদের সবচেয়ে সন্দেহ ছিল একটা চীনে হোটেলের উপর। রাজ্যের যতসব মদখোর আর মাতালের আড্ডা সেই হোটেলে। চোর, ডাকাত, বদমায়েস, পকেটমার ইত্যাদির যাতায়াত সেখানে প্রচুর।

দীপক বললে—কাল ঠিক রাত নটা নাগাদ আমি আর হরিহর সিং দুজনে ছদ্মবেশে প্রাসাদে প্রবেশ করব। তারপর ওদের সন্ধান পেলেই আমরা জোরে জোরে বাঁশী বাজাব। পুলিশ বাহিনী সশস্ত্র হয়ে দূরে ছদ্মবেশে প্রতীক্ষা করবে। আমাদের বাঁশী শুনতে পেলেই তারা হোটেল আক্রমণ করবে।

মিঃ বাজপেয়ী মন দিয়ে সব কথা শুনছিলেন। তিনি এ প্রস্তাবে রাজী হলেন। তিনি বললেন—তাহলে আপনি আজ রাতে বাড়ি ফিরে যান দীপকবাবু।

—বেশ।

—বিশেষ পুলিশ বাহিনী আপনাকে গার্ড দেবে, চিন্তা নেই আপনার।

দীপক বাড়ী ফিরল। হরিহর সিংও তার পশ্চাতেই ছিল।

পরদিন সকাল থেকে সারাদিন পুলিশ বাহিনী শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল যদি জোহরা বা করিমের সন্ধান পাওয়া যায়।

কিন্তু কোথাও তাদের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন বিকেল।

সন্ধ্যা হতে অল্পই দেরী ছিল। পুলিশ বাহিনী সারা বাড়ী পাহারা দিচ্ছিল। তাই দীপকের মনে কোন ভয় ছিল না। সে সারাটা দিন ঘুমিয়ে রাতের অভিযানের জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিল।

সন্ধ্যাবেলা।

হঠাৎ দীপকের ঘরের দরজার কড়া ধরে কে যেন নাড়া দিল ধীরে ধীরে।

ঠক্ ঠক্ ঠক্.....

দীপক অবাক হলো। সে তখন মেকাপ সুরু করবে ভাবছিল। কিন্তু এ সময় একি ব্যাপার? কে এলো আবার এ সময়ে?

দীপক দরজা খুলল। তার সামনেই দাঁড়িয়ে জোহরা।

দীপক বিস্মিত হলো খুব। বললে—তুমি?

জোহরা কোনও কথা না বলে ঘরে ঢুকল। বললে—ভয় নেই। আর কেউ আসেনি, আমি একাই এসেছি।

দীপক বললে—পুলিশ সারাটা শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজছে তোমাকে পাবার জন্যে।

জোহরা বললে—জানি। আপনি কি আমাকে ধরিয়ে দিতে চান?

—হ্যাঁ।

—বেশ, তাই দেবেন। কিন্তু তার আগে যে কথাটা বলতে এসেছি তা বলতে দেবেন ত ?

—বেশ, বলো।

বলে, দীপক আগে জোহরার দেহ তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করল, সে কোনও অস্ত্র লুকিয়ে রেখেছে কিনা তা দেখল।

কিন্তু কোনও অস্ত্র বা অন্য কিছুই তার কাছে পাওয়া গেল না।

দীপক বললে—সারাদিন কোথায় ছিলে ?

হেসে জোহরা বললে—এই বাড়িতেই ছিলাম।

—এখানে ? সে কি ?

—হ্যাঁ, কারণ পুলিশ সারা সহরটা তন্নতন্ন করে খুঁজছে আমাকে। তাই এই বাড়িতেই লুকিয়ে ছিলাম। সবচেয়ে নিরাপদ বাড়ি, তাছাড়া এখানে লুকিয়ে থাকবার প্রচুর জায়গাও আছে।

—তা ত হলো, কিন্তু আমার কাছে কি চাও তুমি ?

গম্ভীরভাবে জোহরা বললে—বিশেষ কথা আছে, মানে—আপনি মাদ্রাজ ছেড়ে এক্ষুনি চলে যান।

দীপক দৃঢ়ভাবে বললে—তুমি ভুল করছ জোহরা। ভয় কাকে বলে তা দীপক চ্যাটার্জী জানে না।

—কিন্তু সে যে আদেশ দিয়েছে।

—কে ?

—অপরাধী সংঘের দলপতি অর্থাৎ হোয়াংলী।

—কিন্তু তাতে তোমার কি স্বার্থ ? তুমি নিজেকে বিপন্ন করে এখানে আমাকে সাবধান করতে এসেছো কেন ?

জোহরা বললে—আমি যদিও আজ ওদের দলে আছি, কিন্তু চিরদিন ছিলাম না। আমার বাবা ও মা ছিলেন বাঙালী। আমার আসল নাম অরুণা।

—কিন্তু একটা কথা। তুমি কেন ওদের দলে পড়ে আছ ?

—আমার যাবার যে উপায় নেই। তাহলে শুনুন আমার কাহিনী।

অরুণা ধীরে ধীরে তার জীবন-কাহিনী শোনাতে লাগল। কেমন করে একজন পশ্চিমা ভদ্রলোকের মোহে পড়ে বাবা-মার আশ্রয় ত্যাগ করে। তারপর কলকাতায় এক নিম্নবস্তিতে কিছুদিন থাকবার পর তাকে বোম্বে নিয়ে গিয়ে হোয়াংলীর দলের হাতে সেই লোকটি বিক্রি করে দেয়।

অবশেষে বললে—দলে আমার একজন মাত্র বন্ধু আছে, সে হলো ড্রাইভার করিম। সে ছাড়া আর সবাইকে আমি ঘৃণা করি।

দীপক বললে—এখান থেকে চলে যাও তুমি।

অরুণা বললে—সে পথ বন্ধ, তাহলে আমি মারা যাব। হোয়াংলী আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রথম দিনেই আমার শরীরে বিষাক্ত এক ওষুধ ফুটিয়ে দিয়েছিল। সে ওষুধ রক্তে মিশলে সাতদিনে লোকের মৃত্যু হয়। কিন্তু সাতদিন আগেই সে এক সবুজ রঙের আরক আমাকে খাইয়ে দেয়, তাই আমার মৃত্যু হয়নি।

দীপক স্তম্ভিত হলো। মানুষকে হাতে রাখার কি অভিনব পন্থা !

অরুণা বললে—তাহলে এবার পুলিশ ডেকে আমায় ধরিয়ে দিন।

তার কথা শুনে দীপক নীরব হয়ে রইল। অরুণা চলে গেলে দীপক ভাবতে লাগল তারই কথা। আশ্চর্য মেয়েটির জীবন-ইতিহাস !

একটু পরে হরিহর সিং এসে বাড়িতে ঢুকলেন।

তাঁকে চেনবার জো নেই। মাথায় ও মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। মুখের চেহারা যেন পাল্টে গেছে, ভয়বিহ্বল মুখ, কপালে বিরাট দাগ।

দীপক বললে—আপনার মেক-আপ খুব ভাল হয়েছে।

তিনি হেসে বললেন—আমি এখন হরিহর সিং নই, চৌকো-চোয়াল।

দীপক বললে—তা ভাল, কিন্তু আমি কি পোশাক পরব ?

—নিম্নশ্রেণীর পকেটমার বা গুণ্ডা এই ধরনের মেক-আপ নিন।

দুজনে মেক-আপ করে পথে বের হলেন।

* * *

কিন্তু কিছুটা দূরে যে বীভৎস চেহারার দুটি লোক এই বাড়ির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করছিল তা তাঁরা বুঝতে পারেননি! দুজনে নিশ্চিন্ত মনে পথ চলতে লাগলেন, লোক দুটিও তাঁদের অনুসরণ-করল। কিছুদূরে একটা সরু গলির মোড়ে এসে পৌঁছতেই হঠাৎ পেছন থেকে দুজনকে আক্রমণ করল তারা। কিছু বোঝবার আগেই দুজনে লোহার রডের আঘাতে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

দীপককে ওরা একটা গাড়িতে তুলল। কিন্তু হরিহরকে দেখে একজন বললে—আরে, এ তো দেখছি আমাদের লোক। তাই না?

অন্যজন বললে—হ্যাঁ, ও বোধহয় গোয়েন্দাটিকে ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

একটু পরে অজ্ঞান দীপকের দেহটা নিয়ে গাড়ি ছুটে চলল।

আহত ছদ্মবেশী হরিহর সিং-এর দেহ পথের উপরেই পড়ে রইল।

। দশ ।

—বন্দী দীপক—

ধীরে ধীরে চোখ মেলে দীপক দেখতে পেলো সে একটা অচেনা ঘরের মধ্যে শুয়ে আছে।

সারা দেহে দুঃসহ ব্যথা। মাথার মধ্যে যেন দপ্ দপ্ করছে। পা দুটি শক্ত করে বাঁধা। ঘরের দেওয়ালে নানা জাতীয় জীবজন্তুর চামড়া টাঙানো। বিচিত্র সব আসবাবপত্রের ওপর বিকটাকৃতি সব মূর্তি। ঘরে ক্ষীণ আলো জ্বলছে, সেই আলো সারা ঘরে যেন কেমন রহস্যময়তার সৃষ্টি করেছে। ঘরের এক কোণে একটি বৈদ্যুতিক চুল্লী জ্বলছে, তাতে শোঁ শোঁ শব্দ হচ্ছে। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটি বিরাট সিংহমূর্তি।

সিংহমূর্তিটি ঘরের মাঝে বসিয়ে রাখার যে কি অর্থ তা দীপক বুঝতে পারলো না। সিংহের পাশে মস্ত বড় একটা ঘণ্টা, তার চারপাশে নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি।

ঘরের দু'পাশের দুটি দরজার মধ্যে একটি খুলে গেল।

কালো আলখাল্লা-পরা একজন লোক ভেতরে ঢুকল। তার চোখ দুটি হতে যেন আগুন ঠিকরে পড়েছ। দীপক বুঝতে পারল সাক্ষাৎ অপরাধী সংঘের দলপতি অর্থাৎ হোয়াংলী।

দীপকের দিকে চেয়ে সে বল'ল—সুপ্রভাত বন্ধু।

দীপক কোনও উত্তর দিল না।

হোয়াংলী তারপর টেবিলের কাছে এগিয়ে গেল। সেখানে ছিল একটা মাঝারি আকৃতির শিশি। সে শিশিটা নিয়ে নীরবে সেটা পরীক্ষা করে বললে—বাঃ, চমৎকার। তারপর দীপকের দিকে ফিরে বললে—কাল রাতে তোমরা আমার আড্ডায় হানা দেবার চেষ্টা করেছিলে?

দীপক বললে—তা হবে।

তীব্র হাসি হেসে হোয়াংলী বললে—তোমার মাথার দাম আছে। সেটাকে আমি কাজে লাগাবো। এক জাতীয় ওষুধ তোমার দেহে প্রবেশ করিয়ে তোমাকে জ্ঞানহীন করে দেব। সাধারণ লোক ভাববে, তুমি মৃত। কিন্তু তোমার মাথাটা মরবে না, সেটি কেটে নিয়ে তোমার দেহটা এখানে রেখে যাবো। লোকে জানবে, তুমি মারা গেছ। কিন্তু মাথাটা যাবে হংকং-এ। সেখানে কোনও চীনেম্যানের দেহের সঙ্গে ওটা জুড়ে দেব অপারেশন করে।

একটু থেমে হোয়াংলী বললে—সারা বিশ্বজয়ের আকাঙ্খা নিয়ে আমার এ অভিযান সুরু হয়েছে। সারা বিশ্বে আমি হবো অপরাধী সম্রাট।

দীপক বললে—তোমার প্রলাপ বন্ধ করো।

—প্রলাপ নয়। এই যে ওষুধ দেখছ, এটা পনের মিনিট ধরে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর ইনজেকশন দিতে হবে।

—তোমার বুজরুকি রাখ, তুমি শীঘ্রই ধরা পড়বে জেনো।

—অত সহজে আমি ধরা পড়ি না। এই যে দেখছ একটা সিংহ, এর বাঁ-চোখ টিপে দিলে মুহূর্তে বাড়িটা ধ্বংস হয়ে যাবে।

স্তব্ধ হলো দীপক।

———

॥ এগারো ॥

—করিম ও হোয়াংলী—

শোঁ শোঁ শব্দ করে উনুনে তরল পদার্থ ফুটে চলেছে। চারদিকে নানা ধরনের যন্ত্রপাতি সাজানো। তবু হোয়াংলী যা বলে গেল দীপক তা বিশ্বাস করতে পারেনি। এমন সময় পেছনে খুট্ করে শব্দ হলো। ঘরে প্রবেশ করল অরুণা। দীপক অভিভূতভাবে বললে—অরুণা—তুমি?

অরুণা দ্রুত দীপকের হাতের শিকল খুলে দিলে। বললে—এই দরজা দিয়ে পালান। বাইরে করিমের লোক বসে আছে। তারা গুপ্তপথে আপনাকে বের করে দেবে।

—হোয়াংলী তোমার উপরে যে অত্যাচার করবে তাহলে?

—সে আপনি ভাববেন না।

এক হাতে দরজা খুলে অন্য হাতে অরুণা তাকে জোর করে বের করে দিতে গেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ওদিকের দরজা খুলে গেল, দেখা গেল আরক্ত মুখে ঢুকল হোয়াংলী।

এদের মুখ শুকিয়ে গেল। কারো মুখে কথা বের হলো না।

* * *

ওদিকে উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারী করে চলেছিলেন মিঃ বাজপেয়ী। এমনভাবে তিনি বোধহয় জীবনে কখনও বিফল হননি।

তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন সার্জেণ্ট জোন্স।

মিঃ বাজপেয়ী পায়চারী বন্ধ করলেন। বললেন—জীবনে এত অপমানিত আমি কখনো হইনি সার্জেণ্ট জোন্স।

—কিন্তু আমরা ত ত্রুটি করিনি।

—তা ঠিক। হয়ত অন্য কোনও বাড়িতে ওদের আসল আড্ডা। আমরা চীনে হোটেলে ক'জন চণ্ডুখোর চীনে ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। দীপকবাবুকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। আর হরিহর সিং মারাত্মকভাবে আহত হয়ে হাসপাতালে আছেন।

সার্জেণ্ট জোন্স বললেন—হাপাতালের রিপোর্ট পড়লাম, তাঁর প্রাণের আশংকা কিছু নেই।

—তা নেই, দীপকবাবুকে খুঁজে বের করতেই হবে আমাদের।

একটু পরে সন্ধ্যা নেমে এলো।

মিঃ বাজপেয়ী স্থির করলেন, সারা মাদ্রাজ শহর তন্ন তন্ন করে খুঁজবেন দীপকের সন্ধানে।

তাঁরা বের হবার জন্যে তৈরী হচ্ছেন, এমন সময় ঘরে প্রবেশ করলেন দুজন লোক।

মিঃ বাজপেয়ী বললেন—আপনারা কারা?

একজন বললেন—আমি হরিহর সিং। আর ইনি আমার দলের ইন্‌স্পেক্টর।

—আপনি আহত হননি?

—সামান্য। আমার মাথার ব্যাণ্ডেজই আমাকে রক্ষা করেছে।

—যাক্, খবর কি বলুন?

—বোম্বেতে ভকত সিং-এর একটি চা-খানা আছে জানেন ত?

—জানি।

—সে এখন মাদ্রাজে আছে। তাকে অনুসরণ করে চীনে হোটেলের পাশে একটা সরু গলিতে প্রবেশ করেছিলেন ইনি।

—তারপর ?

—বাড়িতে ইলেকট্রিক বেড়া, ইনি ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি। মনে হয় ঐ বাড়িতেই দীপকবাবু বন্দী হয়ে আছেন।

— এখন উপায় কি ?

—বাড়িটা একটা দুর্গের মতো। তবে তার ভেতরে প্রবেশ করতে পারলে কাজ হবে। অন্ততঃ পঞ্চাশ জন আর্ম ফোর্স সঙ্গে নেবেন।

—ঠিক আছে।

মিঃ বাজপেয়ী তক্ষুণি বেরিয়ে গেলেন পুলিশ বাহিনীকে রেডি করবার জন্য।

* * *

হোয়াংলীর দিকে তাকিয়ে অরুণার মন আতংকে ভরে উঠল।

হোয়াংলীর হাতে ছিল একটা চাবুক। সেটা নাচাতে নাচাতে বলল সে —বাঃ, চমৎকার! বন্ধু করিমকে ভালই বশ করেছো তুমি দেখছি! কিন্তু করিমকে তুমি ভুল বুঝেছ অরুণা। আমার হুকুম সে কোনদিন অমান্য করেনি—করবেও না। তার হাত থেকে দীপকেরও নিস্তার নেই।

অরুণার মুখ দিয়ে কোনও শব্দ বের হলো না।

তার দিকে তাকিয়ে হোয়াংলী বললে—বিশ্বাসঘাতিনীর শাস্তি কি তা তোমার ভালই জানা আছে অরুণা। তার আগে তোমার চামড়ার উপর আমার চিহ্ন এঁকে দিই। বলেই, সে ডাক দিল—করিম!

—জী, হুজুর!

—এই চাবুক দিয়ে অরুণা আর এই গোয়েন্দাকে ঢিট্ করবে।

—আচ্ছা, হুজুর।

—এই নাও। বলে, হোয়াংলী চাবুকটি দিল করিমের হাতে।

হোয়াংলী বললে—বাঙালী গোয়েন্দা আর অরুণাকে সমঝে দেবে যে, আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা মানুষের সাধ্য নয়।

অরুণার দু'চোখে আঁধার নেমে এলো। করিম শেষ পর্যন্ত তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

দীপককে নিয়ে করিম গেল পাশের ঘরে। সেখান থেকে চাবুকের শব্দ আর আর্তনাদ ভেসে এলো।

হোয়াংলী অরুণাকে বললে—এর পরেই তোমার পালা। আমি চলি। ওধারের কাজ সেরে আবার আসছি।

সে চলে গেলে অরুণা পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে ডাকল —করিম।

করিম এগিয়ে এসে আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললে—আমায় ডাকছ ?

—তুমি আমার সঙ্গে কথা ব'লো না করিম। তুমি বেইমান, তুমি বিশ্বাসঘাতক।

—না, তা নয়। ঐ মিথ্যা শব্দ করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। হোয়াংলী জানে না, এই ফাঁকে কৌশল করে তাকে বের করে দিয়েছি।

—বের করে দিয়েছ!

—হ্যাঁ, এই দেখ।

পাশের ঘরে গিয়ে অরুণা অবাক। সত্যিই সে-ঘরে দীপক নেই।

—বিশ্বাস হলো ত ?

—হ্যাঁ, কিন্তু হোয়াংলী যদি দেখে—

—কোনও ভয় নেই অরুণা। হ্যাঁ, শোনো—পুলিশ একদিক ঘিরে রেখেছে। তুমি এই গুপ্ত-পথে পালাও।

—না।

—কেন ?

—তাহলে হোয়াংলী তোমাকে হত্যা করবে।

—না। তার আগেই তার সঙ্গে বোঝাপড়া হবে। তোমার গায়ে সে হাত দিতে চেয়েছিল, এতদূর সাহস তার!

করিম জোর করে তাকে ঠেলে দেয় গুপ্তদ্বার-পথে।

* * *

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল হোয়াংলী। ভেতরে ঢুকে দেখে তার সামনে দাঁড়িয়ে করিম।

হোয়াংলী বললে—ওরা কোথায়?

—ওরা চলে গেছে।

—শয়তান, বিশ্বাসঘাতক!

হোয়াংলী যেন ক্ষেপে ওঠে। বললে—তোর এত সাহস! তোকে শেষ করব এখুনি শয়তান!

করিম বললে—তার আগে তোমাকেই শেষ করব আমি।

বলে, সে একটা সুদীর্ঘ ছোরা বের করে।

সঙ্গে সঙ্গে দুজনে মল্লযুদ্ধ সুরু হয়ে যায়।

দুজনে ঠিক বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ কাউকে কাবু করতে পারে না।

দীর্ঘক্ষণ পরে করিমকে আহত করে হোয়াংলী ছুটে যায় পাশের ঘরের দিকে।

॥ বারো ॥

—অবশেষে—

দীপক বাইরে বেরিয়ে আসে।

এমন সময় পেছন থেকে কে যেন চীৎকার করে ওঠে—হ্যাণ্ডস্ আপ! দীপক চমকে তাকায়। দেখে সার্জেণ্ট জোন্স। বলে—একি! আপনি?

—ও, আপনি দীপকবাবু? আমি মনে করলাম বোধহয় অপরাধী সংঘের কোন লোক!

—না। ওরা ভেতরে আছে।

—ভেতরে যাওয়া যাবে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তু চারদিকে যে ইলেকট্রিক তারের বেড়া।

—তা বটে। কিন্তু এই পথ দিয়ে যাওয়া যাবে। এটা হলো গুপ্তপথ। কিন্তু সাবধান! শত্রুপক্ষ বড় ভয়ানক।

—তা জানি।

এমন সময় দৌড়ে বেরিয়ে আসে অরুণা।

দীপক বলে—অরুণা, তুমি—

অরুণা ছুটে আসে। বলে—দীপকবাবু, আমার আর ভয় নেই। হোয়াংলী আমাকে মিথ্যা ওষুধ দিত। ওর কোনও মূল্য নেই। ওটা আমাকে আটকে রাখার কৌশল মাত্র।

—কে বললে একথা?

—করিম। যাক, আর দেরী, নয়—শিগ্‌গীর ভেতরে চলুন।

পুলিশ বাহিনী পিস্তল উঁচিয়ে গুপ্তপথে ভেতরে প্রবেশ করল।

দীপক অবাক। বললে—হোয়াংলী গেল কোথায়?

একটা ঘরে রক্তাক্ত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে করিম।

—করিম! দীপক ডাকে। কিন্তু কোনও সাড়া মেলে না।

সার্জেন্ট জোন্স বললে—আঘাত সামান্য, প্রাণের আশংকা নেই।

সিংহমূর্তিটা একপাশে সরে গেছে। তার নীচে একটা গহ্বর। দীপক সুড়ঙ্গ-পথে ধীরে ধীরে নেমে যায় নীচে।

পাতালপুরী। আঁকাবাঁকা পথ। যেখানে পথ শেষ হয়েছে, সেখানে শুরু হয়েছে নদী। দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে একটা লঞ্চ।

দীপক বললে—আমরা একটা লঞ্চ পেলে ধরতে পারতাম ওকে। কোনও উপায় নেই আর। উঃ, শয়তানটা পালাল।

নদীর ধারে একটা চিঠি কুড়িয়ে পেল দীপক। তাতে লেখা:

দীপকবাবু,

দুঃখের বিষয় আমায় ধরতে পারলেন না।

আমার দলের লোকের বিশ্বাসঘাতকতার জন্যেই আমাকে আজ বিপদে পড়তে হলো। তা হোক্, আমাকে ধরতে পারবেন না কিছুতেই।

অপরাধী সংঘ ভেঙে গেল। আমি চললাম ভারতের বাইরে।

আশা করি, ভবিষ্যতে আবার দেখা হবে। ইতি—

দলপতি, অপরাধী সংঘ

দীপক দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—উঃ, একটুর জন্যে শয়তানটা পালাল!

। শেষ।

শ্রীমদনগোপাল গুপ্ত কর্তৃক "শিবপ্রিন্টিং ওয়ার্কস" ৪৬, পার্বতী ঘোষ লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৭ হইতে মুদ্রিত।